

বিদেহী

ধনঞ্জয় বৈরাগী



বাকসাহিত্য

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক—স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাকসাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর—বঙ্কিম বিহারী রায়
অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭/এ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট শিল্পী
কানাই পাল

দু'টাকা পঞ্চাশ ন. প.

স্বর্গত রঞ্জন সেন

যাঁর অকৃপণ স্নেহ ভালবাসা পেয়ে এ জীবনে ধন্য হয়েছি,
যাঁর সহায়তায় পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী হয়েছি,
তাঁরই স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ বই উৎসর্গ করলাম।

স্নেহধন্য—ভাগিনেয়

রচনাকাল—২৩শে জুন থেকে ৯ই জুলাই ১৯৬০—কলিকাতা।

এই লেখকের লেখা

উপন্যাস	এক মুঠো আকাশ	(৫ম মুদ্রণ)
	মধুরাই	(৩য় মুদ্রণ)
নাটক	ধৃতরাষ্ট্র	(২য় মুদ্রণ)
	রুপোলীচাঁদ	(৩য় মুদ্রণ)
	নাট্যগুচ্ছ	
	এক মুঠো আকাশ	(২য় মুদ্রণ)
	রজনী গন্ধা	
	এক পেয়ালা কফি	(২য় মুদ্রণ)
	আর হবে না দেরী	যন্ত্রস্থ)
গল্প	ছিলেন বাবুর দেশে	

কেন যে আজ নিজের কথা লিখতে বসলাম জানি না। লেখবার চেষ্টা আগে কখনও করিনি, সে ক্ষমতাও আমার নেই। তবু লিখছি। এও মানুষের সেই সহজাত প্রবৃত্তি, যার ফলে সে চায় নিজের কথা বলতে অপরের কাছে। আমার কথা শোনার কোন লোক নেই, তাই বোধহয় মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে এই লেখার অবতারণা।

আগে যে রকম কখনও ভাবিনি একদিন কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসব, ঠিক সেই রকমই ক'দিন আগেও ভাবতে পারিনি আবার এই হাজারীবাগে আসব। সেই হাজারীবাগ, ছোট ছোট পাহাড়, টলটলে জলভরা হ্রদ, শাল-মহুয়ার শিশু জঙ্গল। সেই পাগ্‌মিল রোডের বাড়ি, শহরের একপ্রান্তে সাহেবী কায়দায় তৈরি সুদর্শন বাংলো, বিরাট আমবাগানের মধ্যে আগের মতই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই বর্ষাকাল, পয়লা আষাঢ়ের আকাশজোড়া কালো মেঘ, সারাদিনের ঝিরঝিরে বৃষ্টি, বিকেলের ঝড়। সবই ঠিক আগের মতই আছে। শুধু নেই প্রমীলা।

এই প্রথম এ বাড়িতে আমি একলা এলাম। গত দু'বছরের মধ্যে যতবার এখানে এসেছি সব সময়ে সঙ্গে ছিল প্রমীলা। কলকাতার গৃহস্থ বধূ, এখানে এসে মুক্তির আস্বাদ পেত, উপভোগ করত পিতৃগৃহের স্বাধীনতা। শ্বশুরবাড়ির গণ্ডী পেরিয়ে ট্রেনে উঠেই সে সরিয়ে দিত মাথার ঘোমটা, এ বাড়িতে ঢুকে খোঁপা খুলে ঝুলিয়ে দিত লম্বা বেণী। ছুটে বেড়াত এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, ভিতরের উঠোনে, বাইরের প্রাঙ্গণে। কোথা থেকে পেত সে উচ্ছল প্রাণের জোয়ার। সারা বাড়ি মাতিয়ে রাখত একা, ছন্দোময়ী, কিশোরী, নন্দিনী।

প্রমীলার এই রূপ দেখেই একদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। সে প্রায় তিন বছর আগেকার কথা, তখন মাঝে মাঝে আসতাম হাজারীবাগে বেড়াতে, উঠতাম আমারই এক বন্ধুর বাড়ি ক্যানারী পাহাড়ের রাস্তায়। হাজারীবাগ আমার বরাবরই ভাল লাগত, তার নির্জনতার জন্যে। এখানে দেখেছিলাম এমনই একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা সহজে চোখে পড়ে না আর কোন শহরে। ট্রেনলাইন থেকে অনেকখানি দূরে বলেই বোধহয় নাগরিক জীবনের মালিন্য একে স্পর্শ করতে পারেনি। এখানে আকাশ নীল, মেঘেদের স্বাভাবিক রঙ, অমাবস্যার স্পর্শনীয় গাঢ় অন্ধকার, পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার ফোয়ারা। আমি কলকাতার ছেলে, প্রকৃতিকে দেখার বিশেষ সুযোগ পায় নি। রাস্তার ধুলো আর চিম্‌নীর ধোঁয়ায় ভরা আকাশে কখন পাণ্ডুর চাঁদ ওঠে, ব্যস্ত জীবনের মধ্যে তা বড় একটা লক্ষ্য করিনি। তাই হাজারীবাগে প্রকৃতির বিচিত্র খেলা দেখে এ দেশকে স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হত।

এই স্বপ্নময়ী পরিবেশে মায়াবিনীর রূপ নিয়ে দেখা দিল প্রমীলা। কেন জানি না, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতাম চঞ্চল পাখীর মত তার চলাফেরা, মুখ নাড়া, কথা বলা, অকারণে উড়ে উড়ে দূরে চলে যাওয়া। ভালো লাগত তার সরল স্বচ্ছ মন, আবোল-তাবোল কথা বলে হাওয়াতে স্বপ্নরাজ্য তৈরির বাসনা। ইচ্ছে করত, তার সঙ্গে গল্প করতে, ক্যানারী পাহাড়ের ধারে, কিংবা লেকের পাড়ে নির্জনে বসে থাকতে, সকলের আড়ালে একান্তভাবে কাছে পেতে।

আশ্চর্য! আমার ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না। কিছুদিনের মধ্যেই প্রমীলাকে আমি পেলাম, পেলাম সম্পূর্ণ নিজের করে।

ইতিহাস ছোট্ট। প্রমীলা মানুষ মামার বাড়িতে। তার বাবা-মা একসঙ্গে মারা গিয়েছিলেন মোটর অ্যাক্‌সিডেন্টে, রাঁচির রাস্তায়। প্রমীলা তখন সাত বছরের মেয়ে। তার পরে দশ বছর কেটেছে

ডাক্তার মামা বিজন সান্যালের কাছে। আমার সঙ্গে প্রমীলার পরিচয়ের কথা চাপা রইল না, পৌঁছল বিজনবাবুর কানে। কিন্তু রাগ করলেন না, বরং খুশী হলেন তিনি এবং তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবী। আপত্তি উঠল না কোন পক্ষেই। প্রমীলারা আমাদের পাল্টি ঘর। বিজনবাবু চিঠি লিখে সম্মতি নিলেন আমার মায়ের, এক মাসের মধ্যেই শুভ দিন স্থির করে বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে হল পাগ্‌মিল রোডের এই বাংলো থেকে। আজ যে বাইরের বারান্দায় একলা বসে রয়েছি, এখান থেকেই বেজেছিল রোশুনচৌকী। নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন সারা হাজারীবাগের লোক, সেই সঙ্গে আমার আত্মীয়-স্বজনরাও। হৈ-হৈ, আনন্দের মধ্যে বিয়ের হাঙ্গামা চুকিয়ে চপলা প্রমীলাকে ঘোমটামাথায় বৌ সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে তুললাম আমার কলকাতার বাড়িতে। সেখানে শুরু হল তার নতুন জীবন। পদে পদে নিষেধের বেড়া দিয়ে ঘেরা কলকাতার বদ্ধ জীবন।

মাত্র দু'বছরের দাম্পত্য জীবন। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে আতসবাজীর মত একদিন তা নিভে গেল। যখনই মনে হত কলকাতার একঘেয়েমীতে প্রমীলার জীবনের পাতার রঙ ক্রমশঃ লালচে হয়ে আসছে, ওকে নিয়ে চলে আসতাম হাজারীবাগের এই বাড়িতে। আশ্চর্য, ক'দিনের মধ্যে নুয়ে-পড়া লতা যেন সজীব হয়ে উঠত। আবার তার পাতায় দেখা দিত সবুজ হাসি। সেবারও তাই ওকে নিয়ে এসেছিলাম ওর ঝিমিয়ে-পড়া মনে খানিকটা প্রাণসঞ্চারের আশায়। অফিসের কাজে মাসখানেকের জন্যে ঘুরে বেড়াতে হবে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রামে আর শহরে। তাই ভেবেছিলাম, এই একটা মাস প্রমীলা হাজারীবাগে থাকলে ভালো করবে। একলা এ বাড়িতে থাকতে পারবে না বলে ট্যুরে বেরোবার আগে ওকে রেখে আসি বিজনবাবুর বাড়িতে।

যে মামার বাড়িতে প্রমীলা সাত বছর থেকে মানুষ হয়েছে, সেখানেই ঘটল এক আকস্মিক দুর্ঘটনা। ভোরবেলা উঠে অসুস্থা মামীমার জন্যে তাড়াতাড়ি জল গরম করতে গিয়ে প্রমীলার অসতর্ক মুহূর্তে স্টোভ ফেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। তার মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনে ছুটে এল সকলে, কিন্তু সেই আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে থেকে সহজে প্রমীলাকে বার করে আনতে পারল না তারা। বিজনবাবু তাঁর ডাক্তারী বিদ্যের সব কিছু প্রয়োগ করেও বাঁচাতে পারলেন না প্রমীলাকে, নিষ্ঠুর মৃত্যু তাকে তিল তিল করে গ্রাস করল।

এ সবই আমার শোনা কথা। প্রমীলার এই আকস্মিক মৃত্যুর খবর আমি যথাসময়ে পাইনি, তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি যুক্তপ্রদেশে। ইতিমধ্যে চিঠি অবশ্য আমি লিখেছিলাম প্রমীলাকে, উত্তরের প্রত্যাশা না করে। গিরিডিতে পৌঁছে অফিসের ঠিকানায় লেখা বিজনবাবুর চিঠিতে এই দুঃসংবাদ পেয়ে পাথরের মত কঠিন হয়ে গেলাম। একবার মনে হল তখনই হাজারীবাগের উদ্দেশ্যে রওনা হই, কিন্তু হিসেব করে দেখলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। কি হবে আর হাজারীবাগ গিয়ে? সুখের স্মৃতিভরা ঐ জায়গায় একলা কিছুতেই থাকতে পারব না। ফিরে গেলাম কলকাতায়, সেখানেই কুলপুরোহিতকে ডেকে প্রমীলার শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করলাম।

তারপর প্রায় দু'মাস বাদে আবার এই হাজারীবাগে আসতে হল। নিজের ইচ্ছে ছিল না মোটেই, তবু বিজনবাবুর পীড়াপীড়িকে উপেক্ষা করতে পারলাম না। বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে তিনি অনেকদিন থেকেই ডাকাডাকি করছিলেন, সেই উপলক্ষেই এখানে আসা।

আমি কিন্তু প্রথমে প্রমীলাদের পাগ্‌মিল রোডের বাড়িতে উঠিনি।

রামগড় স্টেশন থেকে নেমে সোজা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হয়েছিলাম হাজারীবাগের ডাকবাংলোয়। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ঐখান থেকেই বিজনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা সেরে কলকাতায় ফিরে যাব। কিন্তু তা হোল না।

হাজারীবাগে পৌঁছে সেইদিনই গেলাম বিজনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের ওপর, এই ক'মাসের মধ্যে যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছেন। সারা মুখে বয়সের ছাপ, গালদুটো ঝুলে পড়েছে, ঘোলাটে চোখ। আমি ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করলাম। ভদ্রলোক আমার মাথায় হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, বেঁচে থাক বাবা। এই ক'টি শব্দ উচ্চারণ করতেই তাঁর গলা কেঁপে উঠল, চোখে জল এল। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, জানি, এখানে আসতে তোমার ভাল লাগে না। না লাগবারই কথা, জীবনের শুরুতেই এতবড় একটা শক্ পেলে। বুঝি সব, কিন্তু না ডেকেও তো উপায় নেই। প্রমীলার মামীমার শরীর খুব খারাপ, যে কোনদিনই হয়ত চলে যেতে পারেন। বাড়িতে ঐ দুর্ঘটনার পর থেকে সেই যে বিছানা নিয়েছেন, আর ওঠেন নি। আমার শরীরও খুব ভাল নয়, তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া বিশেষ দরকার।

বৃদ্ধের কথা শুনে আমিও কাতর হয়ে পড়েছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম, মামীমা কোথায়?

—ঘরে শুয়ে আছেন।

—দেখা করব?

বিজনবাবু অভিজ্ঞ গলায় বলেন, না দেখা করাই বোধহয় ভাল। তোমাকে দেখলে হয়ত প্রমীলার কথা মনে পড়বে, উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, তখন আর সামলাতে পারব না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, না, তাহলে আর দেখা করব না। ওঁর কাছ থেকে যে স্নেহ আমরা পেয়েছি, তা কোনদিনই ভোলবার নয়।

মামুলী কথাবার্তার পর বিজনবাবু কাজের কথা পাড়লেন। সাত বছর বয়স থেকে প্রমীলাকে মানুষ করেছি, ওর সম্পত্তি দেখাশুনো করেছি। আর নয়, এবার তোমার হাতে সব তুলে দিয়ে আমি ভার-মুক্ত হতে চাই।

বললাম, যার সম্পত্তি সে-ই রইল না, আমিই বা তা নিয়ে কি করব ?

বৃদ্ধ হুবার মাথা নাড়লেন, বুঝি বাবা, সবই বুঝি, কিন্তু কি করবে বল, এই হল সংসারের নিয়ম। প্রমীলার সব সম্পত্তির দেখাশোনা এখন তোমাকেই করতে হবে। হাজারীবাগে ওর বাবা হুখানা বাড়ি করেছিলেন। একখানা ভাড়া দেওয়া থাকে, তা থেকে মাসে দেড়শো টাকা আয়, তাছাড়া ঐ পাগ্‌মিল রোডের বাংলো। ভাড়ার টাকা থেকে প্রায় পনেরো হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। বিয়ের পর আমি ভেবেছিলাম সব কিছু তোমায় বুঝিয়ে দিয়ে দেব, প্রমীলা তখন দিল না। বিষয়-সম্পত্তির ওপর এতটুকু মায়া ছিল না ওর, জানত আমি তার কোন ক্ষতি হতে দেব না। দিইনিও কোনদিন।

মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললাম, যেরকম চলছে চলুক না—

বৃদ্ধ ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, না বাবা, আর তা হয় না। শরীর গেছে, মন গেছে। এবার আমাকে মুক্তি দাও। আমি উকিলবাবুকে খবর দিয়ে দিচ্ছি তুমি এসেছ বলে, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তারপর তোমার যা ইচ্ছে, যদি ব্যবহার না কর, হুটো বাড়িই ভাড়ায় রেখে দিতে পার।

ম্লান হাসলাম, নাঃ, ভাড়া দেবার ইচ্ছে নেই। ঠিকমত যোগাযোগ

হলে কোন সৎকাজের জন্য দুটি বাড়িই দান করে দেব। আর কিছু না পারি প্রমীলার স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারব।

কথাগুলো বলতে গিয়ে চোখে জল এসে পড়েছিল।

বিজনবাবু আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলেন, অনুভব করলাম সে হাতও কাঁপছে। প্রণাম করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছি, বাগানে নেমে এসে বিজনবাবু আবার আমায় ডাকলেন, কোথায় উঠেছ?

বললাম, ডাকবাংলোয়।

বিজনবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন, পাগ্‌মিল রোডে নিজের বাড়িতে উঠলে না কেন? সেটা ত খালিই পড়ে রয়েছে।

—ভাবলাম সামান্য কয়েকঘণ্টার কাজ, তাই আর—

—না বাবা, কয়েকটা দিন থাকতে হবে বৈকি, জানই তো আদালতের ব্যাপার। বাড়িতে তোমাদের পুরনো চাকর গোবর্ধন রয়েছে, ওই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। আমি তোমাকে এ বাড়িতেই থাকতে বলতাম, তবে তোমার মামীমার শরীরটা ভাল নেই বলে বলতে সাহস পাচ্ছি না।

বাধা দিয়ে বললাম, না-না, সে ঠিক আছে। দেখি, যদি ইচ্ছে করে পাগ্‌মিল রোডেই চলে যাব।

বিজনবাবু স্থিরদৃষ্টিতে আমরা মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কি যেন চিন্তা করছেন। বললেন, আর একটা কথা।

জিজ্ঞেস করলাম, কি বলুন?

বৃদ্ধ থেমে গেলেন, না থাক, পরে বলব।

সেই দিনই বিকেলবেলা বেড়াতে বেড়াতে এসেছিলাম এই

পাগ্‌মিল রোডের বাড়িতে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে অতি পরিচিত এই বাংলোটাকে নতুন চোখে যেন দেখতে লাগলাম। দরজা-জানালা সব বন্ধ। বিরাট একটা দেশলাই-এর বাক্সের মত বাড়ি। চওড়ার চেয়ে লম্বা অনেক বেশী। সাদা দেয়ালের ওপর লাল রঙের খোলার চাল। মাঝখানটা উঁচু, চারদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এ ধরনের বিলিতী বাংলোর একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আর পাঁচটা মামুলী কংক্রিটের ছাদওয়ালা বাড়ির মধ্যে সে হারিয়ে যায় না। আধুনিক হাল-ফ্যাশনের বাড়ির জলুসও এর কাছে ম্লান হয়ে যায়, এমনই এই বাংলোর আভিজাত্য।

গেট পেরিয়ে বাগানের ভেতরে এসে ঢুকলাম। গাছে প্রচুর আম হয়েছে, কুয়োর পাশের ল্যাংড়া আমের গাছটার কী অপূর্ব শোভা! আগে ভাবতাম ওটা বুঝি নিস্ফলা গাছ, কিন্তু এবার দেখলাম ফলের ভারে শাখা নুয়ে পড়েছে। ওপাশে নজরে পড়ল প্রমীলার হাতের তৈরি তরি-তরকারির ছোট্ট বাগান। বাঁশের মাচার ওপরে কুমড়ো হয়েছে, পুঁইশাকের লতাগুলো একজায়গায় ভীড় করে জঙ্গলী গাছের রূপ নিয়েছে। চোখে পড়ল প্রমীলা যে বেগুনের চারাগুলো এর আগের বার এসে লাগিয়েছিল, তাতে অনেক বেগুন হয়েছে। ভিণ্ডি খেতে আমার ভাল লাগে না কোনদিন, প্রমীলারও লাগত না, তবু ও ভিণ্ডির চাষ করতে ভালবাসত। বাগানের বাঁ দিকটা ভিণ্ডিতে ভরা।

—কে ওখানে ?

গলা শুনে পেছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম মালীর ঘর থেকে গোবর্ধন বেরিয়ে আসছে। গোবর্ধন এ বাড়ির পুরনো চাকর, বিশ্বাসী লোক, জোয়ান চেহারা। পেশীবহুল সুঠাম শরীর, একলা বাড়ির সব রকম কাজ করার শক্তি তার আছে। কুয়োর থেকে জল তোলা,

কয়লা ভেঙে উনুন ধরানো, ঘর ঝাড় দেওয়া, কাপড় কাচা, রান্না করা, সব কাজেই সে ওস্তাদ। একটা কাজ করতে করতে হুস করে সাইকেল চড়ে বেরিয়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটে প্রয়োজনীয় বাজার সেরে আবার আগের কাজে লেগে যায়। মেশিনের মত সে কাজ করে। গোবর্ধন এ দেশেরই লোক, কিন্তু বাংলা বলে পরিষ্কার। শুধু কথার ধরনে একটা বিহারী টান আছে, যা শুনলে বোঝা যায় বাংলা তার মাতৃ-ভাষা নয়।

একটু এগিয়েই আমাকে চিনতে পেরে গোবর্ধন এসে পায়ের ধুলো নিল। বললে, মামাবাবুর কাছে শুনেছিলাম আপনি আসবেন, কিন্তু একটা খবর দিলেন না কেন, আমি একেবারে বাস-স্ট্যাণ্ডে চলে যেতাম।

আমার চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, জামাইবাবু, আপনার বাক্স কই, বাইরের দিকে রেখে এসেছেন নাকি?

বলেই গোবর্ধন বাইরের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। আমি বাধা দিয়ে বললাম, না গোবর্ধন, আমি ডাকবাংলোয় উঠেছি।

গোবর্ধন যেন আকাশ থেকে পড়ল, সে কি কথা হুজুর, আপনার নিজের বাড়ি থাকতে আপনি ডাকবাংলোয় থাকবেন!

ওকে আর কি বোঝাব! বললাম, এবার তো আর থাকবার জন্যে আসিনি

—তাহলেও, মামাবাবু শুনলে ভারী রাগ করবেন। চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়ে জিনিসপত্র আমি এখুনি নিয়ে আসব।

বাধা দিয়ে বললাম, আজ থাক গোবর্ধন।

—তাহলে কাল ভোরবেলা আমি ডাকবাংলোয় গিয়ে হাজির হব।

ওর আগ্রহ দেখে আর আপত্তি করতে পারলাম না, বেশ, তাই হবে।

গোবর্ধন এতক্ষণে হাসল, আমি হুজুরের জন্যে কাল মুরগী বানাব, দিদিমণি কত তরকারি করেছিলেন, রোজ দেখি আর সেই সব কথা মনে হয়। কথা বলতে বলতে সেই বিশাল লোকটার চোখদুটো চক চক করে ওঠে।

নিজের অজান্তে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বললাম, এতক্ষণ তো তাই দেখছিলাম।

পরদিন সকালবেলা পাগ্‌মিল রোডের এই বাংলোতে এসে উঠলাম। এতদিন বাদে আবার খোলা হল জানালা-দরজা, ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হল ঘর, দোর, বারান্দা। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে গোবর্ধন এ বাড়ির বদ্ধ আবহাওয়া দূর করে ফিরিয়ে আনল সেই আগের জলুস। আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিলাম ওর কাজ। আর ভাবছিলাম সেই পুরোন দিনের কথা—যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রমীলার মধুর স্মৃতি। খাবার ঘরে বসে খেলাম, বসবার ঘরে বসে পড়লাম, কিন্তু শোবার ঘরে কিছুতেই শুতে পারলাম না। অনুভব করলাম বুকের ওপর একটা চাপা পাথরের ভার। গোবর্ধনকে নির্দেশ দিলাম, বসবার ঘরের ডান দিকে অতিথিদের জন্যে যে শোবার ঘর আছে, সেখানেই বিছানা করে দিতে। তবুও ঘুম এল না। বিছানায় সারা দুপুর এপাশ-ওপাশ করে একসময় উঠে পড়লাম। চা খেতে বসলাম বাইরের বারান্দায়। আস্তে আস্তে দিনের আলো নিভে গেল, জ্বলে উঠল রাস্তার আলো। বড় বড় আমগাছের ছায়া আরো বড় হয়ে ছড়িয়ে রইল এ বাড়ির বারান্দায়, দেয়ালে। গোবর্ধন এসে একবার জিজ্ঞেস করে গেল, বেড়াতে বেরোবেন না হুজুর?

ছোট্ট উত্তর দিলাম, না।

--মামাবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন না?

—কাল করেছি।

—কখন খাবেন রাত্রে?

বললাম, তোমার রান্না তৈরি হয়ে গেলে বোল।

চলে গেল গোবর্ধন। আমি চুপ করে বসে রইলাম। বারান্দার বাঁদিকে একটা প্রকাণ্ড শিশুগাছ, তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইছে শোঁ শোঁ শব্দ করে। সেদিকে তাকিয়ে মনে হল আগেও যখন প্রমীলার সঙ্গে এখানে বসে গল্প করতাম, তখনও হয়ত ঐ শিশুগাছে অমনি করেই শব্দ হত, কিন্তু তা লক্ষ্য করার সময় পাই নি। আজ এই নির্জনে একলা বসে মনে হচ্ছে, ঐ পাগলা শিশুগাছ যেন কি প্রলাপ বকছে। হঠাৎ মনে হল, রাস্তা থেকে কে যেন উঁকি মেরে আমাকে দেখবার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ এদিকওদিক তাকিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে বসে?

গলা শুনে চিনতে পারলাম না কে, উত্তর দেবার ইচ্ছে না থাকলেও বলতে হল, আমি।

আবার প্রশ্ন হল, প্রতুলবাবু নাকি?

বললাম, হ্যাঁ।

আমি মুরারী ঘোষ, প্রমীলার মাস্টারমশায়। একবার ভেতরে আসতে পারি?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম, আসুন।

মুরারী-মাস্টার প্রমীলাকে পড়াতেন তার স্কুল-জীবনে। রোগা লম্বা শরীর, ময়লা রঙ, সরু একজোড়া গোঁফ, বয়সের চাপে গালদুটো ভেতরে ঢুকে গেছে। পরনে ধুতি-শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে ছাতা। আমি তাঁকে বরাবর একই রকম দেখে আসছি।

ভদ্রলোক খেতে খুব ভালবাসতেন, বাড়িতে এলেই প্রমীলা তাঁকে যত্ন করে খাওয়াত।

মুরারী-মাস্টার আমার সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। একটু দম নিয়ে বললেন, আপনাকে দেখে ভালও লাগছে, কতদিন বাদে এলেন। আবার আশ্চর্যও যে হচ্ছি না তা নয়। ও তো তবে ঠিকই বলেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কার কথা বলছেন?

মুরারী-মাস্টার গম্ভীর স্বরে বললেন, প্রমীলার।

বুঝতে না পেরে চোখ তুলে তাকালাম।

—শেক্সপীয়র ঠিকই বলেছেন, There are more things in this heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your philosophy. সত্যিই এ পৃথিবীতে কত যে আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে, তা বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না।

মুরারী-মাস্টারের ভণিতা শুনতে আর ভাল লাগছিল না, একটু কড়া হয়েই বললাম, যা বলতে চান একটু খুলে বলুন না।

মুরারী-মাস্টার একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা যে বেঁচে থাকে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

বললাম, ও নিয়ে ভাববার কোন অবকাশ হয় নি।

—তাহলেও আত্মার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাসী কি না?

বিরক্ত হয়ে বললাম, বোধহয় না।

মনে হল, এ কথায় মুরারী-মাস্টার ক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন, যে কথা বলতে এসেছিলাম তা বলে আর কোন লাভ হবে না।

—বলেই দেখুন না।

মুরারী-মাস্টার চুপ করে কি যেন ভাবলেন,—সেই ভাল, বলেই

যাই। আমার কর্তব্য আমি করব। সব শুনে আপনার যা ইচ্ছে, তাই করবেন। আপনি জানেন কিনা, জানি না, বহুদিন থেকে আমি প্রেতলোক নিয়ে চর্চা করেছি। ছোটবেলা থেকেই পরলোকের কথা জানবার আমার অদম্য স্পৃহা ছিল। বহুদিনের সাধনায় মৃত্যুর পরের যে জগৎ, তাকে আমি বুঝতে পেরেছি।

মনে পড়ল প্রমীলা আমাকে বলেছিল, এই মুরারী-মাস্টারের পাল্লায় পড়ে সে কিছুদিন প্ল্যানচেট করেছিল। মিডিয়ামের সাহায্যে ডেকে এনেছিল তার মৃত মা-বাবার প্রেতাত্মাকে। বললাম, সে কথা আমি জানি।

মুরারী-মাস্টার গুরুগম্ভীর হাসলেন,—জানি না, আমার সম্বন্ধে কতটুকু শুনেছেন। ভূত নামিয়ে অন্ধকার ঘরে টেবিল নাচ করানো, কিংবা প্ল্যানচেট-এর মধ্যে পেন্সিল দিয়ে প্রেতাত্মার কাছ থেকে প্রশ্নোত্তর জানা—এ সবকিছুই আমি ছেলেখেলা মনে করি। আত্মার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি প্রেতাত্মা ইচ্ছে করলে দেহ ধারণ করতে পারে, বিশ্বাস করি ইহজগতে যে বাসনা অপূর্ণ রেখে তাকে চলে যেতে হয়েছে, তা পূরণ করার জন্যে এ পৃথিবীতে সে আসে।

থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনও আত্মাকে দেহ ধারণ করতে দেখেছেন ?

—দেখেছি বইকি, কতবার দেখেছি। একটু থেমে দূরে শিশু-গাছটার দিকে তাকিয়ে মুরারী-মাস্টার বলেন, কালও তো দেখলাম।

—কাকে ?

মুরারী-মাস্টার হাসেন,—আমি প্রমীলার কথা বলছি।

শুনেই বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল।—প্রমীলাকে আপনি দেখেছেন?

মুরারী-মাস্টার নীরবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

—তার মৃত্যুর পর?

—একবার নয়, দুবার। প্রথমবার দেখি চলন্ত বাসে। আমি রাঁচী থেকে সেদিন ফিরছি। তন্দ্রা মতন এসেছিল, হঠাৎ কার কথা শুনে ঘোর কেটে গেল। স্পষ্ট দেখলাম প্রমীলার মুখ, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সে যেন বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। বললে, এখন আমি যাচ্ছি মাস্টারমশায়, পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা করবো। কথা বলতে বলতেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল প্রমীলা। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এ ধরনের ঘটনার অর্থ আমি জানতাম। যা ভেবেছিলাম, হলও তাই। বাস্ থেকে নেমে সাইকেল-রিক্সা নিয়ে সোজা গেলাম প্রমীলার মামার বাড়ি। কাউকেই কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। দেখলাম ধরাধরি করে তার শবদেহ নিয়ে বাইরে খাটের ওপর সাজিয়ে রাখছে।

কেন জানি না, মুরারী-মাস্টারের কথাগুলো গাঁজা বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা আগেও অনেক শুনেছি, মনে কখনও দাগ কাটে নি। কিন্তু প্রমীলার কথা শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সিগারেট খাবেন?

—আমি খাই না।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, তারপর?

মুরারী-মাস্টার আগের মতই জলদগম্ভীর স্বরে বলে চললেন, দ্বিতীয়বার প্রমীলার দেখা পেলাম কাল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর

ধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার। হয়ত পুরোপুরি পেরে উঠি না, হয়ত ভুলচুক হয়, কিন্তু তাই বলে ওরা আমায় অবজ্ঞাভরে এতখানি দূরে সরিয়ে রাখবে? কি দোষ করেছি আমি? তুমি বিচার কর।

তোমার বোন ইলা শুকনো ডালের মত রস-কসহীন। প্রত্যেকটি কথার মধ্যে লুকোন থাকে বিদ্রূপ আর শ্লেষ। এ পর্যন্ত আমার সঙ্গে একদিনও সে ভাল ব্যবহার করল না। সারাক্ষণ রাজকন্যের মত বিছানায় শুয়ে থাকে, আর উপুড় হয়ে বুকের মধ্যে বালিশ গুঁজে নভেল পড়ে। মুখে বৌদি বললেও আমাকে সে মনে করে এ বাড়ির বিনা মাইনের ঝি। হাজার রকম ফরমাশ তার লেগেই আছে। প্রথম প্রথম ভাবতাম, ওর কথামত সব কাজ করে একদিন নিশ্চয় ওর মন জয় করতে পারব। কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছি, ও চেষ্টা বৃথা। তোমাকেও দু-একবার বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখেছি তুমি তাতে কান দিতে চাও না। বোধহয় বাড়িতে অশান্তি হবার ভয়ে। কিন্তু আর যে আমি পারছি না।

তোমার মায়ের কথা ভাবতে আমার চোখে জল আসে। জান, তোমার সঙ্গে যখন আমার সম্বন্ধ হয়, তখন সাগ্রহে রাজী হয়েছিলাম এই ভেবে যে, তোমার মা আছেন। এ বাড়িতে এসে আবার আমি মাতৃস্নেহ পাব, যা থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমি সাত বছর বয়সে। তুমি যদি একবার আমার মাকে দেখতে পেতে, কী করুণাময়ী মূর্তি, কী অপরিসীম স্নেহ, ভালবাসা! আমাদের আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ মা। আমার ধারণা ছিল সব মা-ই বোধহয় এক ধরনের। কিন্তু তোমার মাকে দেখে সবই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। উনি বলেন, আমি নাকি তোমাকে মায়ার ফাঁদে ভুলিয়ে বিয়ে করেছি, আমি অপয়া, তা না হলে অত অল্পবয়সে বাপ-মা হারালাম কেন। আমার জন্যে পাছে এ বাড়িতেও কোন অমঙ্গল ঘটে সেই ভয়ে

তিনি সর্বদাই শঙ্কিত। ওঁর মুখে আমার সম্বোধন হল, 'ও বড়মানুষের মেয়ে'। আশ্চর্য, আমার ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় বড়লোকী চাল উনি কোথায় দেখলেন! পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বাড়ির ঝি-এর সঙ্গে বসেও উনি আমার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেন। তারা আমায় দেখলে মুখ টিপে হাসে, জানে গিন্নীমার কাছে আমার নামে নিন্দে করতে পারলে ভাত খাবার সময় মাছের একটা বড় টুকরো পাবে।

আমার সবচেয়ে কি খারাপ লাগে জান, যতক্ষণ তুমি বাড়িতে থাক, ওদের সম্পূর্ণ আর এক মূর্তি। আমাকে নিয়ে যে তাদের কত আনন্দ তা যেন প্রকাশ করতে পারছেন না। এ ভণ্ডামীর মানে কি? কেন এরা মুখোশ পরে বসে থাকে? তোমাকে আর বলতেও ভাল লাগে না, জানি, তুমি সেই এক ঘেয়ে সুরে বলবে, একটু ধৈর্য ধরে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিশ্বাস কর, এক মিনিট আর আমার এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না। এ যেন নরক-যন্ত্রণা, এ থেকে কবে মুক্তি পাব বলতে পার?

ভাগ্যহীনা—প্রমীলা।

চিঠিটা পড়লাম। এক একবার মনে হল এ যেন আমি পড়ছি না, প্রমীলাই কথাগুলো বলছে। আমার বাড়ি সম্বন্ধে ঠিক এই ধরনের কথাই সে মাঝে মাঝে বলত। আমি বুঝতাম, ইলা বা মা হয়ত প্রমীলার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে নি, কিন্তু আমারই বা কি করবার ছিল? ভেবেছিলাম, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে, তার মধ্যে এ কি বিপর্যয় ঘটে গেল!

অবাক হলাম এই ভেবে, যদি মুরারী-মাস্টারের কথা সত্যি হয়, যদি প্রমীলার বিদেহী আত্মাই এ চিঠি আমায় পড়তে বলে থাকে,

তবে কেন বলল সে? এ সব কথাই তো আমি জানতাম। আমার মা-বোনের সঙ্গে যে তার বনিবনা হয় নি, এ আর নতুন কথা কি!

কিন্তু এ নিয়ে আর ভাবতে ইচ্ছে করল না, কেন জানি না, গা-টা ছম-ছম করে উঠল। যদি সে নিজেই আমাকে কিছু বলতে আসে। তার অশরীরী মূর্তির কথা কল্পনা করে মনে মনে শঙ্কিত হলাম।

গোবর্ধনকে ডেকে বললাম, কই, খাবার দাও।

সে বললে, একটু দেরি হবে হুজুর, রুটিগুলো এখনও সেঁকা হয় নি।

বললাম, চল, দেখি কেমন কাজ করছ।

—আসুন হুজুর, বলে হাসতে হাসতে গোবর্ধন আমাকে নিয়ে গেল খাবারঘরে। পাখা ছেড়ে চেয়ার এগিয়ে দিল বসবার জন্যে। পাশেই রান্নাঘর, আমি খোলা দরজা দিয়ে দেখছি গোবর্ধন কাজ করছে। একলা বারান্দায় বসে থাকার চেয়ে এ ঢের ভালো।

কাজ করতে করতেই গোবর্ধন হাজারীবাগের অনেক কথাই বলে যায়। বাজারে এ বছর মাছ উঠছে খুব, চালানী মাছ ছাড়াও বড় বড় কাতলা। আমও নাকি অপর্যাপ্ত, ভাল ল্যাংড়া টাকায় আটটা। ঈদের সময় থেকে মুরগী ছোঁবার যো নেই, আগুন দাম।

খাবারের থালা আমার সামনে সাজিয়ে দিয়ে বলে, আপনার জন্যে আজকে যে মুরগী এনেছি হুজুর, তেমন কিছু বড় নয়, মাঝারি সাইজ, কিন্তু দুটাকার কমে কিছুতেই ছাড়লে না। কলকাতায় কত দাম হবে?

খেতে খেতে উত্তর দিলাম, কি জানি, কলকাতার দর ঠিক জানি না।

—শুনছি নাকি রেল লাইন বসবে, তাহলে হাজারীবাগও কলকাতার মত শহর হয়ে যাবে ।

—তা হয়তো হবে, কিন্তু এত সুন্দর আর থাকবে না। ধোঁয়া আর ধুলোয় কলকাতা তো ভালই লাগে না।

এ ধরনের পাঁচরকম কথা হতে হতে গোবর্ধন বলে, ক্যানারী পাহাড়ে একদিন বেড়াতে যাবেন হুজুর, ওখানে একটা বাঘ ধরে রেখেছে।

আশ্চর্য হলাম,—বাঘ !

—হ্যাঁ, একটা চিতাবাঘ। ধরা পড়েছিল গিরিডিতে, সেখান থেকে এনে ক্যানারী পাহাড়ে রেখেছে, শুনছি নাকি ওখানে একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা বানাবে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ভেতরের উঠোনেই পায়চারি করলাম, বাইরের বারান্দায় আর বসলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যে গোবর্ধনও খেয়ে নিল, ওকে বললাম বিছানা নিয়ে আসতে, আমার ঘরেই মেঝেতে ও শোবে।

গোবর্ধন কিন্তু আমার ঘরে শুতে চাইল না, বৈঠকখানায় তার নিজের বিছানা পাতল। মাঝখানের দরজাটা খুলে রেখে আমি খাটে শুয়ে পড়লাম। কিছুতেই ঘুম আসছে না, বার বার এপাশ-ওপাশ ফিরছি, পাখার হাওয়া থাকা সত্ত্বেও মশারীর বাইরে শুনছি মশার গুঞ্জন।

স্রেফ কথা বলার জন্যেই জিজ্ঞেস করলাম, গোবর্ধন, তোমার গরম লাগছে না তো ?

পাশের ঘর থেকে সে বলল, না হুজুর, জানালা দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা


MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
6335
LIBRARY.
23.5.61

হাওয়া আসছে। আর কথা বলবার কিছু ছিল না, চুপ করে রইলাম। একটু বাদে গোবর্ধনই নিজে থেকে বলে, একটা কথা বলব জামাইবাবু ?

—বল।

—দিদিমণি আমায় বলেছিলেন, আমার মেয়ের জন্যে একটা সোনার হার দেবেন, সাদির সব ঠিকঠাক হয়ে আছে, তারপর তো হঠাৎ উনি চলে গেলেন।

বললাম, দিদিমণি যখন বলে গেছেন, হার তুমি নিশ্চয় পাবে। মেয়ের বিয়ের আগে জানিও, কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দেবো।

—আপনি গরীবের মা-বাপ হুজুর।

কৃতজ্ঞতায় গোবর্ধনের গলা বুজে আসে,—এটুকু বয়সে দিদিমণি চলে গেলেন।—তার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আমার কানে এল।

কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, গোবর্ধন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ঘুমুবে নাই বা কেন, সারাদিন পরিশ্রম করে বিছানায় শুলেই আপনা হতে ঘুম এসে পড়ে। কাল পর্যন্ত আমারও এসেছিল, কিন্তু আজ আসছে না। উঃ, এ বড় কষ্ট। এখন বুঝতে পারছি, সারা রাত জেগে থেকে প্রমীলা কেন এত অধীর হয়ে পড়ত। বুঝতে পারছি কেন সে আমায় ঐ চিঠিটা পড়াতে চেয়েছিল। না ঘুমুবার এই মর্মান্তিক কষ্ট উপলব্ধি করবার জন্যেই নিশ্চয়।

কত রাত এখন জানি না। কাছেই কোন গাছ থেকে একটা রাত-জাগা পাখী ডাকছে। বাইরে ঝড় উঠল নাকি, হাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কোন একটা ঘরের জানালা বোধহয় খোলা আছে। দুম্‌দাম আছড়ে পড়ার শব্দ হচ্ছে তার। আমার ঘরেও কোথা থেকে ঢুকল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। মশারীর মধ্যেও অনুভব করলাম তার শীতল

স্পর্শ। আস্তে আস্তে কে যেন আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিলে। আমি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে উঠে নিজেকে বেশ হালকা মনে হল। চায়ের সঙ্গে অনেকদিন বাদে আবার গরম জিলিপি আনিয়ে খেলাম। গোবর্ধনকে দুপুরের খাবার তৈরি করতে বলে দিয়ে, মুখ হাত পা ধুয়ে কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়লাম ক্যানারী পাহাড়ের দিকে। মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম, আজ আমার কলেজের সহপাঠী অমলেন্দুর সঙ্গে দেখা করব। প্রমীলাদের সঙ্গে পরিচয় হবার আগে হাজারীবাগে এলে এই অমলেন্দুদের বাড়িতেই উঠতাম।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অমলেন্দুর বাবা হাজারীবাগে এসে ওকালতি করতে শুরু করেন। তাঁর ছিল অসাধারণ মেধা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে পসার গেল বেড়ে। যে কোন শক্ত মকদ্দমায় তাঁকে সওয়াল করতে হত, মক্কেলদের জন্মেছিল তাঁর ওপরে অগাধ বিশ্বাস। কতবার নাকি হারা কেসের মোড় ঘুরিয়ে মক্কেলকে জিতিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণেই পারিশ্রমিকও পেতেন সবচেয়ে বেশী। জীবিতাবস্থায় তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেছেন সুপাত্রে, দুই ছেলের জন্যে রেখে গেছেন অনেক সম্পত্তি। হাজারীবাগে তিনখানা বাড়ি, কলকাতায় একখানা, পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে বিরাট আমবাগান, বর্ধমান বিভাগে তিরিশ বিঘে ধানজমি। বড়ছেলে বিমলেন্দুর লেখাপড়া বিশেষ হল না, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিয়েও হয়েছিল। বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনো নিয়েই তাঁর দিন কেটে যায়। ছোট ছেলে অমলেন্দু কলকাতায় পড়ত আমারই সঙ্গে, ছুটির সময় কতবার আমায় নিয়ে বেড়াতে এসেছে এই হাজারীবাগে। আগে ওরা থাকত বাজারের

কাছে। এখন সে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে চলে এসেছে ক্যানারী পাহাড়ের রাস্তায়। এটাও তাদের নিজেদের বাড়ি, আগে ভাড়া দিত চেঞ্জারদের।

মোড়ের থেকে একটা সাইকেল-রিক্সা ধরে, লেকের মধ্যে দিয়ে গিয়ে যখন ওদের বাড়িতে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় নটা। অমলেন্দু এখন হাজারীবাগে নেই, সে নতুন কাজ নিয়ে চলে গেছে কোডার্মায়। ওর দাদা-বৌদি আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। কিছুক্ষণ ধরে চলল পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন, প্রমীলার অকালমৃত্যুর জন্যে তাঁরা দুঃখপ্রকাশ করলেন। প্রায় একই ধরনের কথা সকলের মুখে শুনে শুনে এখন আর উত্তর দেবার কিছু খুঁজে পাই না। যতদূর সম্ভব করুণ মুখ করে বসে থাকি।

বৌদি জিজ্ঞেস করলেন, কিছুদিন থাকা হবে তো?

বললাম, হাতে কয়েকটা কাজ আছে, সেরে তবে ফিরব।

—একদিন আমাদের এখানে খেতে হবে।

—সে আর নতুন কথা কি। কতদিন তো এখানে খেয়েছি।

—প্রমীলাকে যখন শেষবার তুমি এখানে রেখে গেলে, ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখনই বড় রোগা মনে হল।

বললাম, শেষের দিকে ওর শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। ভেবেছিলাম বেশ কিছুদিন হাজারীবাগে রেখে শরীরটা সারিয়ে নিয়ে যাব।

—কপাল ভাই, সবই কপাল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বৌদি উঠে পড়লেন, দেখ ভাই, পালিয়ে যেও না। এখুনি গরম চা নিয়ে আসছি।

লৌকিকতা করে বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না।

দাদার সঙ্গে আলোচনা হল নানারকম রাজনৈতিক সমস্যা

নিয়ে। বিহারে বাঙালীরা টিকে থাকতে পারবে কিনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসাধারণের লাভ হবে কতটুকু, শেষ পর্যন্ত ইংরিজী ভাষা বিদায় নিলে ভারতীয়রা বিদেশে গিয়ে শিক্ষা নেবে কি করে।

এসব বিষয়ে কথা বলতে আমার যে খুব ভাল লাগছিল তা নয়, উনি একটার পর একটা প্রশ্ন করছিলেন, আমি উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম।

একটু পরেই চা নিয়ে এলেন বৌদি, তাঁর পেছনে নীল রঙের শাড়ি-পরা আর একটি মেয়ে, হাতে তার জলখাবারের থালা।

বৌদি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, লিলিকে চিনতে পারলে না প্রতুল ?

এতক্ষণ মুখ তুলে তাকাইনি, এবার দেখে হেসে বললাম, সে কি, চিনতে পারব না কেন? তবে আগের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে—

দাদা বললেন, যে সে কথা নয় প্রতুল, আমার শ্যালিকা এখন এম. এ. পড়ছেন। কালে কালে কত দেখব বল তো? এদিকে জামাইবাবু তো ম্যাট্রিকের গণ্ডী পেরোতে পারল না।

আমি যখন অমলেন্দুর সঙ্গে এখানে আসতাম, মাঝে মাঝে লিলিকে দেখেছি, ও আসত দিদির কাছে বেড়াতে। বৌদিদের বাপের বাড়ি পাটনায়, বাবা ব্যবসাদার। রোজগার করেছেন যথেষ্ট। অনেক বছর আগে এক কঠিন মামলার দায়ে পড়ে তিনি অমলেন্দুর বাবার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ক্রমে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। মক্কেল হিসেবে এ বাড়িতে ঢুকে বিমলেন্দুকে একেবারে জামাই করে বাড়ি ফিরলেন। সেই থেকে দু'বাড়ির মধ্যেই বড় প্রীতির সম্পর্ক।

লিলির সঙ্গে অবশ্য আমার দেখা হয়নি অনেকদিন। শেষ

দেখেছিলাম আমরা যখন বি. এ. পড়ি, ও তখন পড়ত ইস্কুলে। সেদিনকার কিশোরী লিলি আজ যুবতী। কলেজের বেড়া পেরিয়ে ইউনিভার্সিটির গণ্ডীতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু চেহারার আদল এতটুকুও বদলায়নি, সেই ছিপছিপে গড়ন, শ্যামলা রঙ, টানা টানা চোখ। মুখে সেই দুষ্টুমি-মাখা হাসি, জংলী লতার মত একরাশ কোঁকড়ান ঝাঁকড়া চুল, কাঁটার বাধা না মেনে ক্ষণে ক্ষণে খুলে পড়ে। এলোমেলো হাওয়ায় ছোট ছোট চুলগুলো উড়ে আসে মুখের ওপর।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কি সাবজেক্ট নিয়ে এম. এ. পড়া হচ্ছে?

লিলি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, ফিলজফি।

—ওরে বাবা, সে তো খুব শক্ত ব্যাপার। অনেক কিছু পড়তে হয়।

লিলি জিজ্ঞেস করে, আপনার কি সাবজেক্ট ছিল?

—অর্থনীতি নিয়ে কিছুদিন পড়েছিলাম, মাস ছয়েকের বেশি, তারপরে কাজে ঢুকে ছেড়েছিলাম।

বৌদি বললেন, ঠাকুরপো থাকলে খুব খুশী হোত, ও তোমাকে বড় ভালবাসে। ক'দিন আগেও তোমার কথা কত বলছিল। নারে লিলি?

লিলি দিদির কথায় সায় দিয়ে বলে, অমলেন্দুদা আপনাদের শিকারের কথা খুব গল্প করেন, ধানুয়া-ভানুয়ার রাস্তায় আপনি নাকি নাকের ডগায় একটা ময়ূর পেয়েও মারতে পারেন নি।

পুরোন কথা মনে পড়ায় হাসি পেয়ে গেল, বললাম, আমার অসাক্ষাতে অমলটা বুঝি এই সব মিথ্যে কথা বলে।

বৌদিও হেসে ফেলেন,—এটা কিন্তু ঠাকুরপো মিথ্যে বলেনি।

আমার বেশ মনে আছে তোমরা মুখ চুন করে ফিরলে, ঠাকুরপো তোমায় খুব বকছিল, আমি এসে তোমায় বাঁচালাম

—বাঃ, ঐ কথাটাই বুঝি শুধু মনে রাখলেন বৌদি, আর আমি যে টাটিঝরিয়ার কাছে এক গুলিতে কোট্‌রা মারলাম, সে কথাটা ভুলে গেলেন ?

আমাদের কথা থামিয়ে দিয়ে লিলি বললে, হাজারীবাগের এই এক মজা। যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। পাঁচ দিনের জন্যে এখানে বেড়াতে এলেও শিকারের গল্প না করে সে ছাড়বে না।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে যখন ওদের বাড়ি থেকে উঠলাম, বেলা প্রায় বারটা। আসবার সময় সবাইকে বলে এলাম, সময় পেলে আসবেন মাঝে মাঝে, পাগ্‌মিল রোডের বাংলোতেই উঠেছি। অতবড় বাড়িতে একলা থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে

বৌদি সমবেদনা প্রকাশ করলেন, তা তো হবেই ভাই. তাছাড়া একলা তো আর কোনদিন থাকোনি। আমরা তো যাবই, তবে সময় করে তুমি রোজই একবার করে বেড়িয়ে যেও। পুরোন দিনের গল্প করা যাবে।

-তথাস্তু। বলে বেরিয়ে এলাম।

বাড়ি ফিরে দেখলাম গোবর্ধন তখনও রান্না করছে। বললে, আজকে দু'তিন রকম তরকারি করছি, তাই একটু দেরি হয়ে গেল জামাইবাবু।

বললাম, ঠিক আছে। আমি স্নান করে নি।

জামাকাপড় বার করার জন্যে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম, আজ দিনের

বেলা এ বাড়ির ঘরগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বড় আশ্চর্য লাগছিল। কাল যাকে মনে হচ্ছিল অচেনা, আজ তাকে দেখে মনে হল অতিপরিচিত। প্রত্যেকটি ঘর আমি চিনি, কোথায় কোন আসবাবটি আছে, কেন কবে প্রমীলা একটা জিনিস আরেক জায়গায় রেখেছিল, তাও আমার জানা। মনে হল, আগে যে রকম দিনের পর দিন এখানে থেকেছি, এখনও ঠিক সেই রকমই রয়েছি বোধহয়, এর মধ্যে যে বহুদিনের ছেদ পড়ে গেছে তা ভুলে গেলাম। গতকাল রাত্রে মুরারী-মাস্টারের কথা শুনে আমি যে মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম, হঠাৎ হয়তো প্রমীলার বিদেহী আত্মার সাক্ষাৎ পেতে পারি বলে শঙ্কিত হয়েছিলাম, তা মনে হতেই বড় মজা লাগল। বালিশের তলা থেকে চিঠিটা বার করে আর একবার পড়লাম। কালকের রাত্রের অন্ধকারে প্রথমবার পড়বার সময় যাও-বা এ চিঠির একটা ক্ষীণ যুক্তি খুঁজে পেয়েছিলাম, দিনের বেলায় তা পড়ে পরম হাস্যজনক বলে মনে হল। একবার ভাবলাম চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দি, তারপর কি মনে হল, রেখে দিলাম বাক্সর মধ্যে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আজ কিন্তু খুব সহজেই ঘুম এল।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, জেগে উঠে দেখলাম চারদিক অন্ধকার করে কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। ঘরগুলোর ভেতর আরো অন্ধকার, কোন রকমে হাতড়াতে হাতড়াতে বেরিয়ে এলাম ভেতরের উঠোনে। গোবর্ধনের নাম করে দুচারবার ডাকলাম, কোন সাড়া পেলাম না। বোধহয় আমি ঘুমুচ্ছি দেখে বাজারে গেছে।

আমবাগানে ঝুপ-ঝাপ শব্দ হচ্ছে, হাওয়া লেগে আম পড়ছে নিশ্চয়। খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে কুয়োর ধারের আমগাছগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট

বোঝা না গেলেও মনে হল কে যেন গাছতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, বোধহয় আম কুড়িয়ে আঁচলের মধ্যে রাখছে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। বিদ্যুতের শিখায় তাকে দেখলাম, দেখলাম তার ঘন কালো চুল জমাট অন্ধকারের মত সারা পিঠের ওপর ছড়ানো। আমার বুকের মধ্যে স্পন্দন বেড়ে গেল, কোন রকমে দরজার চৌকাঠটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীল রঙের শাড়ি-পরা আমকুড়ানী মেয়েটি হাওয়ার টাল সামলাতে সামলাতে এগিয়ে এল আমার কাছে। আবার বিদ্যুৎ চমকাল। এতক্ষণে তার মুখ দেখতে পেলাম। না, আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তা নয়, আমার বুকের ওপর থেকে একটা ভার নেমে গেল। আমাকে দেখে মেয়েটি দেহাতী ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, আমি কে? কোন উত্তর দিতে পারলাম না, তখনও আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছি। জানি না, আমাকে কি ভেবে মেয়েটি চলে গেল। হয়ত ভাবল, এ বাড়িতে আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি।

অতি ধীর পদক্ষেপে ফিরে এলাম ঘরের মধ্যে। আলো জ্বালবার জন্যে সুইচ টিপলাম, কিন্তু আলো জ্বলল না। এখানে অবশ্য ঝড়-বৃষ্টির দিনে ইলেক্‌ট্রিকের লাইন খারাপ হয়ে যাওয়া নতুন নয়। তবু যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। ভেতর আর বাইরের অন্ধকার এখন একাকার হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঝড়ের আর্তনাদ, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর ভেসে উঠছে আলো-আঁধারিতে-মেশা আমকুড়ানী মেয়েটির ছবি, আর তার সেই কেশরাশি।

ঠিক এই ধরনের চুল ছিল প্রমীলার। যখন সে মাথা ঘষে সামনে এসে দাঁড়াত, মনে হত কোন এক বনদেবী। মনে পড়ত কপালকুণ্ডলার বর্ণনা। সেই 'আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি, তদগ্রে দেহরত্ন যেন চিত্রপটের ওপর চিত্র লিখা রহিয়াছে।'

আমি চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম, ঘন ঘন পায়চারি করলাম, সিগারেট ধরালাম। কিন্তু কিছুতেই মনের জোর ফিরিয়ে আনতে পারলাম না। মনে হল ঘরে আমি একা নই। আর একজন কেউ রয়েছে। তার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। মনে হয় অন্ধকার ভেদ করে তাকালে আমি দেখতে পাব তার সেই চুলের রাশি, দেখতে পাব তার পাণ্ডুর মুখ।

দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম বাইরের বারান্দায়। বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত শরীর ভিজে গেল, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম।

গেটের মুখ থেকে গোবর্ধনের গলা শুনতে পেলাম।- হুজুর, জলে ভিজছেন কেন, ঠাণ্ডা লাগবে যে!

ওর গলা শুনে আশ্বস্ত হলাম, চেঁচিয়ে বললাম, আলো জ্বলছে না গোবর্ধন, সব ফিউজ হয়ে গেছে।

—আমি এখনই হারিকেন জ্বালিয়ে আনছি।

আঃ, বড় নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। মনে মনে স্থির করলাম, প্রমীলার কথামত গোবর্ধনের মেয়ের জন্যে সোনার হার আমি নিশ্চয় গড়িয়ে দেবো।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আর একলা বসে থাকতে হল না। বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের প্রকোপ কমে এসেছিল। একটু পরে আলো জ্বলল, আস্তে আস্তে বৃষ্টিও ধরে এল। শুধু টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, একটা ছাতা মাথায় দিয়ে উমেশবাবু এসে হাজির। উমেশ মল্লিক প্রমীলাদের বাড়ির উকিল, ওদের সবরকম সম্পত্তি দেখাশুনো করেন। গোলগাল, মোটা, বেঁটে মানুষ, ফর্সা রঙ, মাথাভরা চকচকে টাক, সব সময় মুখে লেগে আছে অমায়িক হাসি। আমাকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার করলেন। বললেন, বড়

দুর্যোগ মশাই, আমি তো ভাবলাম, আজ আর বোধহয় আসতে পারব না।

তাঁর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বললাম, সত্যিই তো, বিকেল থেকে আকাশের যে অবস্থা, না বেরোলেই ভাল করতেন।

ভদ্রলোক হাসলেন, তা বললে কি চলে, মক্কেল হল আমাদের লক্ষ্মী, কাজ থাকলে যেতেই হবে। এই ধরুন না আপনার কথা, ব্যস্ত মানুষ, দুদিনের জন্যে হয়ত এখানে এসেছেন। তার মধ্যে আপনার কাজ যদি ঠিকমত করে দিতে না পারি, পরে আমাকে আর ডাকবেন কেন?

আপত্তি করে বললাম, আপনার সঙ্গে কি আমার উকিল-মক্কেলের সম্পর্ক, জানি তো প্রমীলা আপনাকে কতখানি শ্রদ্ধা করত।

—আহা, ও মেয়েটার কথা আর বলবেন না,—উমেশ মল্লিকের গলা ভারী হয়ে আসে, ওকে আমি জন্মাতে দেখেছি।

একটু থেমে বললাম, চা করতে বলি, ঠাণ্ডার দিন আপত্তি হবে না নিশ্চয়।

গোবর্ধনকে ডেকে হুকুম করলাম চা আর খানিকটা গরম আলুভাজা নিয়ে আসবার জন্যে। উমেশ মল্লিক পাকা উকিল, অবান্তর কথা বেশী বলেন না। আলাপ জমাবার জন্যে দুচারটে বৈঠকী কথা বলেই আবার কাজের কথা পাড়েন।

—এবার আপনি যে কবে আসছেন আগে জানতে পারিনি, তাই কাগজপত্র সব ঠিক করা ছিল না। তবু যত শীঘ্র পারি, আপনার নামে দরখাস্ত পেশ করে দেব। আপনাকে সই করতে হবে। সেজন্যে আর একটা সপ্তাহ থেকে গেলে ভাল হয়।

বললাম, দেরি থাকলে পরে আবার আসব।

উমেশ মল্লিক বাধা দেন, দরখাস্ত এখনি করা উচিত, আর দেরি করবেন না। কোর্টের ব্যাপার, নানারকম আইন-কানুন আছে। সেইমত চলাই ভাল।

—তাহলেও কেন যে প্রমীলার মামা এত তাড়া করছেন, বুঝতে পারছি না।

—ওঁর আর দোষ কি, বয়েস বাড়ছে তো। যতদিন শক্তি ছিল, প্রমীলার সব সম্পত্তিই দেখাশুনো করেছেন। এখন আর পারেন না।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, করুন।

উমেশ মল্লিক চোখে চালসের চশমা লাগিয়ে হাতের দুচারটে কাগজ উল্টে-পাল্টে কি দেখলেন, বললেন, বিজনবাবুর কাছে শুনলাম, আপনি এ বাড়ি দুটোই কোন পরোপকারী প্রতিষ্ঠানে দান করে দেবেন বলে স্থির করেছেন। যদিও এ নিয়ে আমার কোন কথা বলা উচিত নয়, তবু আমি আপনাদের পরিবারের অনেকদিনের বন্ধু, তাই বলছি, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করবেন না। প্রায় দেড়লাখ টাকার সম্পত্তি, বুঝে-শুনে কাজ করবেন।

—আমি শুধু প্রমীলার স্মৃতির জন্যে—

—দান করে দিলেই কি স্মৃতিরক্ষা হয় প্রতুলবাবু, আরও কতরকম কাজ করা যায়। ধরুন, একটা ছোটখাট কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠান, যেখানে হয়তো অনেকগুলি দুঃস্থা মেয়ে সূচের কাজ করে দুবেলা দুটো খেতে পাবে। কিংবা অন্ধ ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল, সরকারের কাছ থেকে তার জন্য সাহায্য পাবেন।

বললাম, এ সবে অনেক রকম হাঙ্গামা, আমার সময় কোথায়?

উমেশবাবু উৎসাহিত গলায় বলেন, আপনি না দেখতে পারেন, আমরা দেখব।

—দেখি কি হয়।

ইতিমধ্যে গোবর্ধন গরম চা আর আলুভাজা দিয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডার মধ্যে গল্প করতে করতে খেতে বেশ ভাল লাগে। দু-চারটে মামুলি কথার পর উমেশবাবু বললেন, এতক্ষণ তো আপনাকে জিজ্ঞেসই করা হয়নি, কলকাতায় আপনার এমন কোন জানা লোক আছে, যিনি জমির ওপর ইনভেস্ট করতে চান ?

—কেন বলুন তো ?

—আমার দাদা অ্যাটর্নী, কলকাতায় অফিস। ওঁর কাছেই শুনেছিলাম নারকোলডাঙ্গার দক্ষিণে প্রায় বিশ-বাইশ বিঘে জমি আছে ওঁদের এক মক্কেলের। একেবারে গোল্ড মাইন।

—কিরকম ?

—এখন যদি আপনি জমিটা ধরে রাখেন পাঁচ বছরের মধ্যে দেখবেন কি দাম বাড়বে ওখানে। এখন যে দামে এক বিঘে জমি কিনবেন, পরে আপনি সেই দামে এক কাঠা বিক্রী করবেন। বুঝতে পারছেন কত লাভ ?

বললাম, তাহলেও এ তো একরকম স্পেকুলেশন।

উমেশ মল্লিক বিজ্ঞের মত হাসলেন, রিস্ক না নিলে কি আর টাকা হয় মশাই। যাই হোক, কথাটা মনে রাখবেন, যদি কোন ভাল লোক পান, আমার দাদার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দিলেই হবে। আমি ওদের অফিসের ঠিকানাটা দিয়ে দেবো।

কলকাতায় নতুন করে সম্পত্তি কেনার বাসনা আমার মোটেই নেই। তাছাড়া অতগুলো টাকা একসঙ্গে পাবই বা কোথায় ? কুড়ি বিঘে জমি নিয়ে খেলা করা তো সোজা কথা নয়। সেইজন্যে উমেশবাবুর কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিলাম না।

বিদায় নেবার সময় আবার হাত তুলে নমস্কার করে বলে

গেলেন, সোম-মঙ্গলবার নাগাদ আবার আপনার সঙ্গে এসে দেখা করব।

প্রতি-নমস্কার করে হেসে বললাম, যখন খুশি আসবেন। তবে পরের দিন এখানে খেয়ে যেতে হবে।

—সে তো অতি উত্তম প্রস্তাব, গোবর্ধনটা রাঁধে ভাল।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

সকাল বেলা তখনও সূর্যের তেজ তীব্র হয়ে ওঠেনি। আমবাগানে পায়চারি করছিলাম। চোখে পড়ল গোলাপি রঙের একটি সুন্দর ডালিয়া ফুল, তরকারির বাগানের একপ্রান্তে টবের ওপরে ফুটে রয়েছে। কাছে এগিয়ে গেলাম, আগে এ বাগানে ডালিয়া দেখিনি, তাই বিস্মিত হলাম।

একটু বাদে গোবর্ধন এল, হাতে বাজারের থলি। পকেট থেকে টাকা বার করে তার হাতে দিলাম। সে বললে, ফুলটা কি চমৎকার হয়েছে, না জামাইবাবু?

বললাম, হ্যাঁ।

—দিদিমণি ঐটা কোথা থেকে এনে লাগিয়েছিলেন, বোধহয় কারো বাগান থেকে।

কালকের সেই আমকুড়ানী মেয়েটির কথা মনে পড়ল, গোবর্ধনকে জিজ্ঞেস করলাম সে কে।

—ও, আপনি লখিয়ার কথা বলছেন? গোবর্ধন হেসে বললে, ও এক কুঞ্জরার মেয়ে। ঐ আমগাছ ছুটোর ইজারা নিয়েছে ওর বাপ। তাই প্রায়ই এসে দেখে যায় আম পড়ল কিনা। এইবার বৃষ্টি নেমেছে, মনে হয় ছু'একদিনের মধ্যেই সব আম পেড়ে নিয়ে চলে যাবে।

গোবর্ধন চলে যাচ্ছিল। খানিক দূর গিয়ে আবার ফিরে এল। বললে, জামাইবাবু, দিদিমণির গাড়িটা কারখানায় পড়ে রয়েছে, বলেন তো মিস্ত্রীকে বলি এখানে নিয়ে আসতে।

বললাম, থাক, কি হবে ওসব হাঙ্গামা বাড়িয়ে।

গোবর্ধন জোর দিয়ে বলে, হাঙ্গামার কি আছে, গাড়ি পড়ে রয়েছে কারখানায়, আপনি এখানে এসেছেন, ক'দিন চড়বেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললাম, আচ্ছা আনতে বোল, দেখি কি অবস্থায় আছে।

প্রমীলার বাবার একটা ছোট অস্টিন গাড়ি ছিল। পুরোন সেই উনিশ শ' ছত্রিশ মডেলের। শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে মন্দ নয়, সেইজন্যে প্রমীলা ওটা কখনই বিক্রী করতে দেয়নি। আমরা যখন থাকতাম না, গাড়ি থাকত কারখানায় কিংবা প্রমীলার মামার বাড়ি। অবশ্য অনেকদিন সেটা ব্যবহার করা হয়নি। জানিনা এখন সচল অবস্থায় আছে কি না।

আজ শনিবার। দুপুরের দিকে ঘুমুতে ইচ্ছে করল না। কাছেই সিনেমা-হল্, শনি-রোববার দুপুরবেলা বাংলা ছবি দেখায়। সকাল থেকেই সাইকেল-রিক্সায় ছবির পোস্টার লাগিয়ে তারস্বরে মাইকের গান বাজাতে বাজাতে কানের পর্দা ফাটাবার জোগাড় করেছিল।

যখন সিনেমা-হলে গিয়ে পৌঁছলাম, ছবি শুরু হয়ে গেছে। দোতলার টিকিট কেটে অন্ধকারের মধ্যেই গিয়ে বসে পড়লাম। মামুলী বাংলা ছবি, দেখতে যে খুব ভাল লাগছিল তা নয়, তবু সময় কেটে যাচ্ছে এই আর কি। বিরামের সময় আলো জ্বলে উঠল, একটা

সিগারেট খাবার জন্যে দাঁড়ালাম। নজরে পড়ল ডানদিকের কোণে বসে রয়েছেন অমলেন্দুর বৌদি আর তার ছোট বোন লিলি। তারা আমাকে দেখেছিলেন। স্মিত হাসলেন। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম।

—কেমন লাগছে ?

উত্তর দিলেন বৌদি, মুখে তাঁর একগাল পান, যে রকম নাম শুনেছিলাম সে রকম কিছু নয়।

লিলি আপত্তি করল, আমার কিন্তু ভাল লাগছে।

—ভাল লাগার আছেটা কি ? না একটা ভাল গান, না গল্পের মাথামুণ্ডু, আর কী নায়িকার ছিরি !

লিলি থামিয়ে দেয়, আঃ দিদি, আস্তে, পাশের লোকেরা শুনতে পাবে।

বললাম, এ পাড়ায় যখন এসেছেন, গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

বৌদি মুখে জর্দা পুরলেন, আহা-হা, ছেলের কী বিনয় !

হেসে বললাম, সিনেমা দেখার পর চা-তেষ্টা পাবে নিশ্চয়, আমার ওখানে চা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন। নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—কিরে লিলি, তোর দেরি হয়ে যাবে না তো ?

লিলি কোন উত্তর দিল না, বুঝলাম মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

ছবি ভাঙল পাঁচটার পর। বাংলো কাছে বলেই আর সাইকেল-রিক্সা নেওয়া হল না, তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে এসে হাজির হলাম।

বৌদি লিলিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই আগে এ বাড়িতে এসেছিস ?

লিলি জানাল, না।

—বড় চমৎকার বাড়ি। প্রমীলার বাবা শুনেছি খুব শৌখিন লোক ছিলেন। তাই না উনি এমন সাহেবী ঢঙে বাড়ি করেছিলেন।

কথা বলার খাতিরেই বললাম, অসুবিধেও আছে। প্রত্যেক বছর চালে মেরামতের কাজ করতে হয়, তা না হলেই বৃষ্টির জল পড়ে।

—তা হোক একটু খরচা, থেকে কি আরাম বল্ তো লিলি। আমাদের ঐ কংক্রিটের বাড়িতে গরমের সময় দুপুরবেলা তো টিঁকতে পারি না। এ বাড়িতে দুটো ছাদ, মোটা মোটা দেয়াল, আঃ কী ঠাণ্ডা!

বললাম, প্রমীলাও এ বাড়ি খুব ভালবাসত।

—কেন, তোমার লাগে না?

শুধু হাসলাম, কোন উত্তর দিলাম না।

লিলিকে নিয়ে বৌদি সারা বাড়িটা ঘুরে বেড়ালেন। বসবার ঘর, শোবার ঘর কিছুই বাকী রইল না, অনর্গল কথা ব'লে প্রমীলা কি ভাবে সংসার করত, তার ছবি এঁকে যান। আমার কোন কথা বলার প্রয়োজন হল না, যদিও সারাক্ষণই ওঁদের সঙ্গে ছিলাম।

খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে দেখি গোবর্ধন গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সঙ্গে মিস্ত্রী। বাইরের রঙের অবস্থা দেখে যে খুব উৎসাহ বোধ করলাম তা নয়, তবে মিস্ত্রী ভরসা দিয়ে বললে, এঞ্জিন খুব ভাল আছে, চালাতে কোন অসুবিধে হবে না।

জিজ্ঞেস করলাম, চাকাগুলোর কি অবস্থা?

গোবর্ধন জানাল, পেছনের দুটো চাকাই দিদিমণি এবার পাল্টেছিলেন।

মিস্ত্রী আমার সামনে একটা বিল এগিয়ে দিলে,—ব্যাটারিটা

খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমি একটা লোন ব্যাটারি দিয়ে দিয়েছি, সেল্‌ফও চলছে। আপনি এখন খুশিমনে চড়তে পারবেন।

বিলটা পকেটে পুরে মিস্ত্রীকে বিদায় করার জন্যে বললাম, তুমি মঙ্গলবার এসে টাকা নিয়ে যেও, আমি একদিন চড়ে দেখি।

মিস্ত্রী চলে যেতে গোবর্ধনকে তাড়াতাড়ি চা বানাতে বললাম।

বৌদি একবার আপত্তি করেছিলেন, দেরি হয়ে যাবে না তো প্রতুল ঠাকুরপো ?

বললাম, কিছু না। গাড়ি এসে গেছে, হুস করে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—দেখো, এমন জোরে গাড়ি হাঁকিও না যে আবার গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়।

বললাম, সে কথা মনে আছে আপনার ?

—মনে থাকবে না, উঃ, কী কাণ্ডই করেছিলে! বেচারী প্রমীলা ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিলো।

—দোষ আমারই, ব্রেকটা ভালো ছিল না, অন্ধকারে রাঁচী থেকে ফিরছি, সামলাতে পারলাম না, গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল।

বাড়ির মধ্যে না ঢুকে বাগানেই কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। থপ করে একটা পাকা আম পড়ল, লিলি এগিয়ে হাতে তুলে নিল, গন্ধ শুঁকে বললে, এ যে একেবারে পাকা টুকটুকে।

বললাম, জাতও ভাল, ল্যাংড়া। বলো তো এখনি কেটে দিই।

বৌদি পিক ফেললেন, রক্ষে কর বাবা, বিকেলবেলা আম খেয়ে পেটটা জয়ঢাক হোক আর কি। তার চেয়ে বরং রোজ সন্ধ্যের দিকে, মানে সূর্য ডোবার পর, আমাদের বাড়িতে এস! তোমার গাড়ি করে কাছাকাছি জায়গাগুলো ঘুরে আসা যাবে। লিলি অনেকদিন পরে এল, বেচারী বাড়িতেই আটকে রয়েছে।

বললাম, সে তো যাবই, কিন্তু ছেলেরা কোথায়, সেদিন তো দেখতে পেলাম না।

—তারা গেছে কাকার কাছে, কোডার্মায়। স্কুল খুললে ফিরবে।

সেদিন লিলিদের সঙ্গে যে কথাবার্তা হল, তা থেকে বুঝলাম সে আরও দিন পনেরো আছে হাজারীবাগে। কয়েকদিন বাদে তার বাবা আসবেন পাটনা থেকে, লিলিকে নিয়ে যাবার জন্যে। লিলির ইচ্ছে, ভাল করে পরীক্ষায় পাস করে সে হবে কলেজের প্রফেসর। ইচ্ছে আছে, পরে ফিলজফিতেই পি. এইচ. ডি. করবে। কথাবার্তা শুনে মনে হল না লেখাপড়ার ওপর খুব বেশী রকমের ওর আগ্রহ আছে, সাধারণ পড়ুয়া মেয়েদের মামুলী কথাবার্তার মতই তার উক্তি।

এক সময় বৌদি বললেন, লিলি বলে বিয়ে করবে না।

আমার উত্তর দেবার কিছু ছিল না, তবু বললাম, ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। যার যেমন ইচ্ছে, তা নিয়ে কথা বলা উচিত নয়।

লিলি চাইছিল না যে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা চলে। তাই বল্লে, দিদি, এইজন্যে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না। বিয়ে আর বিয়ে—এছাড়া যেন কিছু আর ভাবা যায় না।

বৌদি হেসে বললেন, ভুল হয়ে গেছে বাবা, আর বলব না।

লিলি নিজের মনেই বলে যায়।—দেখছি তো কতজনের বিয়ে হল, ক'জন তার মধ্যে সত্যিকার সুখী হয়েছে। বাপ-মায়ের পছন্দই বা কি, আর নিজে ভালবেসে বিয়ে করলেই বা কি, সব সমান। শুধু ঝাগড়াঝাঁটি, কান্না আর অনুশোচনা।

আপত্তি করে বললাম, ঠিক এভাবে বললে ভুল বলা হবে। সুখী দম্পতিও তো প্রচুর। তারা আছে বলেই সংসার চলছে।

বৌদি আমার কথায় উৎসাহ বোধ করলেন,—ঠিক বলেছ প্রতুল, ও লেখাপড়া-জানা মেয়েকে কি আমি বোঝাতে পারি। আহা, দেখ না এই প্রতুল আর প্রমীলাকে, চোখ জুড়িয়ে যেত। ভগবান অন্তরায় হলেন তো ওরা কি করবে। এমন সুখী পরিবার আমি খুব কম দেখেছি।

কথাটা এদিকে মোড় ফেরায় নিজে বড় অস্বস্তি বোধ করলাম। আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না। তাড়াতাড়ি চা-পর্ব শেষ করে বৌদি আর লিলিকে গাড়ির পেছনে বসিয়ে চলতে শুরু করলাম ক্যানারী পাহাড়ের রাস্তায়। বৌদি অনর্গল কথা বলে গেলেন, একটা কথাও কানে গেল না। গাড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো দিনের স্মৃতি ভিড় করে ঠেলে এলো।

অমলেন্দুর বাড়ির দরজায় গাড়ি থামালাম। বৌদি আর লিলি নেমে গেল। ওরা ভেবেছিল আমিও নামবো।

বললাম—আজ থাক, কাজ আছে।

বৌদি তবু বললেন, দাদার সঙ্গে দেখা করবে না ?

—আর একদিন হবে।

—এসো কিন্তু—

—কথা দিলাম আসবো।

দু-একটা সামান্য জিনিস কেনার ছিল মনোহারীর দোকান থেকে। হসপিটাল রোড ধরে বাজারের দিকে চললাম।

কতক্ষণ চলেছিলাম জানি না। যখন খেয়াল হল, দেখলাম হাসপাতাল ছাড়িয়ে বাঙালীর মিষ্টির দোকান, পাঞ্জাবীর হোটেল পেরিয়ে আমার গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলেছে চাত্‌রার রাস্তায়।

বুচারটোলীর মুসলমান পল্লী পড়ে রইল পেছনে, আরও এগিয়ে গিয়ে পাঁচিল-ঘেরা বিরাট গোরস্থান। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাস্তা বড় মসৃণ, চমৎকার। উঁচু-নীচু লালমাটির বুক চিরে কালো রাস্তা এঁকে-বেঁকে নদীর সরীসৃপছন্দে এগিয়ে গেছে। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘের সমারোহ, রাস্তার ধারে ধারে আম আর শিরীষের গাছ, মাঝে মাঝে ফাঁকা বিস্তীর্ণ জমি। অতি দূরে ক্যানারীর আকারেরই আর একটি ছোট পাহাড়, দেখেছি অনেকবার—নাম জানি না। এ রাস্তা দিয়ে আগে কতদিন শিকার করতে গেছি। নাকে ভেসে এল একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ, দেখলাম ডানদিকে হাজারীবাগের যাবতীয় ময়লা ফেলবার বিস্তীর্ণ মাঠ। আর একটু এগিয়ে চোখে পড়ল দু-একটা পাকা ঘর, বুঝলাম ক্ষীরগাঁও শ্মশানে এসে পড়েছি।

কে যেন আমার গাড়ি থামিয়ে দিল। নামলাম। শ্মশান না জানলে এ জায়গা বড় মনোরম। চারদিক ফাঁকা, অতি সুন্দর দৃশ্য। ক্ষীরগাঁও নদীর ক্ষীণ ধারা অনেকটা দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। প্রশস্ত বালির চড়া।

মনে হল, জলের দিক থেকে বালি পার হয়ে কে যেন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমটা চিনতে পারিনি, কাছে এলে বুঝলাম মুরারী-মাস্টার। আর যাই হোক, এখানে তাকে দেখব আশা করিনি, সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ?

মুরারী-মাস্টার সহজ গলায় উত্তর দিলেন, প্রায়ই আমি এখানে আসি।

—শ্মশানে !

—তাতে কি হয়েছে। আমাকে সাধনা করতে হয়।

আর কিছু বললাম না, মুরারী-মাস্টার ছোট ছোট বালিয়াড়ীর

দিকে তাকিয়ে বলেন, কত লোককে নিয়ে যে এখানে এসেছি, ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, ছোঁড়া—তার আর ইয়ত্তা নেই।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। মুরারী-মাস্টার একটা মাথাঢাকা জায়গা দেখিয়ে বললেন, চলুন, ওখানে গিয়ে দাঁড়াই। মিছিমিছি ভিজবেন কেন?

দু'জনে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম। বললেন, এ জায়গাটা হয়ে বড় উপকার হয়েছে। বৃষ্টির সময় শবদেহ নিয়ে আর জলে ভিজতে হয় না।

আমি চারিদিকটা তাকিয়ে দেখছিলাম। মুরারী-মাস্টার থামতে চান না,—প্রমীলাকে যেদিন এখানে নিয়ে এলাম, সেদিনও এইরকম অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছিল, এই জায়গায় এনে ওর খাট রাখলাম, চারদিকে আমরা দাঁড়িয়ে, পাছে ওর গায়ে ছাট লাগে। চওড়া লালপাড় শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, গরবিনী এয়োস্ত্রীর সাজ। ওর সেই মেঘের মত কালো চুল খোলা, পায়ে লাল আলতা। ওঃ, সেদিন মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। মৃতদেহ দেখে বোঝবার উপায় ছিল না যে ও পুড়ে মারা গেছে, মুখে তার আগুনের এতটুকু আঁচও লাগে নি।

শুনতে শুনতে আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। প্রমীলার মৃত্যুর কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, কিন্তু এমন নিখুঁত ভাবে বোধহয় কেউ বর্ণনা করতে পারেনি। কিংবা হয়ত শ্মশানে দাঁড়িয়ে শুনছি বলেই মাস্টারের কথামত পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠছিল চোখের সামনে। মনে হল, আমি যেন প্রমীলাকে দেখতে পেলাম, তার সেই অন্তিম শয্যায় চোখ বুজে শুয়ে আছে। দেখতে পেলাম, শ্মশানে জ্বলছে চিতার আগুন। দেখতে পেলাম, নদীর জলে শেষকৃত্য সম্পন্ন করে নীচু মাথায় আত্মীয়রা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। একে একে সবাই মিলিয়ে

গেল, শুধু সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন মুরারী-মাস্টার। বোধহয় আমার শরীর কাঁপছিল, বুঝতে পেরে মুরারী-মাস্টার আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখলেন,—চলুন, বাড়ি ফেরা যাক।

যন্ত্র-চালিতের মত তার সঙ্গে শ্মশান থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম। ফিরে চললাম বাড়ির দিকে। অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তা দেখছি। কথা বলতে ভাল লাগছিল না, কিন্তু মুরারী-মাস্টার ছাড়বার পাত্র নয়, নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন, সেদিনকার চিঠি পড়ার পর আত্মার অস্তিত্বে আপনার বিশ্বাস জন্মেছে প্রতুলবাবু?

অযথা জোর দিয়ে বললাম, না। ওতে বিশ্বাস করার মত কিছু ছিল না।

মাস্টার অবাক হলেন, তাহলে প্রমীলা ওটা পড়তে দিল কেন?

বিদ্রূপের সুরে বললাম, আমিও তো তাই ভাবছি। আশা করি, আর আপনার সঙ্গে প্রমীলার প্রেতাত্মার সাক্ষাৎ হয়নি?

মুরারী-মাস্টার গম্ভীর গলায় বললেন, হয়েছে।

ঠিক এ উত্তর শুনব আশা করিনি, কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলল সে?

মাস্টার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, আপনাদের বাগানে একটা ডালিয়া ফুল ফুটেছে দেখেছেন?

—দেখেছি।

—ওটা প্রমীলার নিজের হাতের লাগানো।

—জানি।

ঐ টবের মধ্যে মাটির ভেতরে সিগারেটের টিনে ও একটা কি জিনিস রেখে গেছে। কি আমি তা জানি না, তবে অনুরোধ করেছে

ওটা আপনাকে খুলে দেখবার জন্যে। দেখলেই নাকি আপনি সব বুঝতে পারবেন।

আশ্চর্য, কাল প্রথম ডালিয়া ফুলটা দেখার পর থেকেই আমার কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়েছে। অসময়ের ফুল, অত বড়, অত সুন্দর আগে কখনও দেখিনি। তাছাড়া ঐ একটিমাত্রই টবে-পোঁতা গাছ আমাদের বাগানে। ওর ভেতর কি আছে জানবার জন্যে মন বড় উতলা হয়ে উঠল। সে ভাব গোপন করে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বললাম, বলছেন যখন, বেশ তো দেখে রাখব।

—আমিও এসে একদিন খবর নিয়ে যাব।

—নিশ্চয় আসবেন।

গাড়ি এসে গিয়েছিল বাজারের কাছে, চারিদিকে আলো জ্বলছে, মুরারী-মাস্টার নেমে গেলেন চৌরাস্তার মোড়ে। আমি দোকান থেকে ছুচারটে দরকারি জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। আজ কিন্তু ঠিক মনে করে টর্চ নিয়ে এসেছি, তিন ব্যাটারির বড় টর্চ।

আমি কোনদিনই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিনি। আমি ভাবতাম, আত্মা বলে স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নেই, সুতরাং মরণের পর জীবনের কোন কথাই উঠতে পারে না। চিন্তা মাথার উৎপন্ন ফল, মস্তিষ্কের কাজ ফুরিয়ে গেলেই মনের কাজও ফুরিয়ে যায়। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বন্ধ হলেই অনুভূতি ও চেতনা লোপ পায়। এ শুধু আমার মনের কথা নয়, আধুনিক বিজ্ঞানীদেরও এই মত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'পাকস্থলী থেকে যেমন পরিপাক শক্তির, যকৃৎ থেকে যেমন পিত্তের উৎপত্তি, মস্তিষ্ক থেকে তেমনি চিন্তা ও চেতনার সৃষ্টি। খাদ্যসামগ্রী যেমন পাকস্থলীতে পড়বার পর বদলে

অন্য জিনিসে দাঁড়ায়, মাথার বস্তুও তেমনি স্নায়ুমণ্ডলীর সংস্পর্শে ভাব, চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, বাক্য প্রভৃতিতে পরিণত হয়। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, মন অথবা আত্মাকে মস্তিষ্কের রস-নির্যাস বলা যেতে পারে। তাই মস্তিষ্ক নিক্রিয় হয়ে গেলে আত্মাও লোপ পেয়ে যায়।'

জানি না আমার এ মতের জন্যে হয়ত অনেকে বলবেন, আমি নাস্তিক, আমি বস্তুবাদী। যে যাই বলুক, ইন্দ্রিয় দিয়ে যা পাওয়া যায় না, তার অস্তিত্ব স্বীকার করব কি করে ?

প্রমীলা কিন্তু এ বিষয়ে কোনদিনই আমার সঙ্গে একমত হতে পারেনি। সে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করত, বলত, দিনের পর যেমন রাত্রি, সেরকম জন্মের পর মৃত্যু, সংসারের সমস্ত মায়া কাটিয়ে মরণের পারে যে অজানা দেশ সেখানে সবাইকে চলে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে আত্মা বিশ্রাম নেয়।

আমি বলতাম, এটা তোমার মনের কল্পনা।

সে বলত, না, মাস্টারমশায় আমায় বলেছেন।

—কে, মুরারী-মাস্টার ?

—হ্যাঁ। উনি প্রেতলোক নিয়ে চর্চা করেছেন। উনি বলেন, মৃত্যুর পর জীবাত্মা সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে পরলোকে যায়, কিন্তু সেখানে বিশ্রাম পায় না।' অতৃপ্ত বাসনার দংশনে সে শান্তি পায় না, ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে, আবার সময় হলে চলে যায় পরলোকে। এই ভাবেই জীবন-মৃত্যুর খেয়া পার হতে হয় তাকে বহুবার।

আমি কথাগুলো শুনতাম আর হাসতাম। একদিন বুঝি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, যত সব গাঁজা। দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল প্রমীলা, চোখ-মুখ লাল করে বলেছিল, বেশ, এমনিতে তো তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি যদি তোমার আগে মারা যাই, তাহলে প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেবো আত্মার অস্তিত্ব আছে কি নেই ?

আমি কোন উত্তর দিই নি, হেসেছিলাম।

প্রমীলা বিদ্রূপ করে বলেছিল, দেখো, তখন আবার ভয় পেও না যেন!

আজ মনে হচ্ছে সেই প্রমাণ দেবার জন্যেই কি প্রমীলার প্রেতাত্মা মুরারী-মাস্টারকে দিয়ে আমায় বলে পাঠিয়েছিল ডালিয়া গাছের টবের মাটি খুঁড়ে দেখার জন্যে! সে রাত্রে কিছুতেই আমি কৌতূহল দমন করতে পারিনি। বাড়ি ফিরে টর্চ হাতে করে বাগানের মধ্যে গিয়েছিলাম। হাতে ছিল একটা লোহার খুন্তি, অল্প চেষ্টা করতেই টবের ভেতর থেকে পেলাম সিগারেটের কৌটো। বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসে আলোর তলায় খুলে দেখি একটা পাতলা সোনার হার। সাদা কাগজের ওপর লাল পেন্সিলে লেখা, গোবর্ধনের মেয়ের জন্যে। এ যে প্রমীলার হাতের লেখা, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। তার মারা যাবার তিনদিন আগের তারিখ লেখা রয়েছে কাগজটার উপর।

হারটা হাতে নিতেই সমস্ত শরীর আমার কেঁপে উঠল, কিসের যেন অব্যক্ত উত্তেজনা। এ অনুভূতি ভয়ের কি বিস্ময়ের বলা শক্ত। কিছুক্ষণের জন্যে আমার স্বাভাবিক চিন্তাধারা বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল প্রমীলা তার জিদ বজায় রেখেছে, পরলোকের অস্তিত্ব সে আমাকে বিশ্বাস না করিয়ে ছাড়বে না। মনে হল, এ বাড়িতে আর থাকা বোধহয় আমার পক্ষে ভাল হবে না, এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।

আমি যখন এইরকম সম্মোহিত ভাবে বসে আছি, হঠাৎ গোবর্ধন এসে হাজির হল। জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে জামাইবাবু?

চমকে উঠলাম, কে?

—খাবার দেবো?

—কেন?

—সে কি, খাবেন না ?

—আচ্ছা দাও।

গোবর্ধন আমার হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ওটা কি ?

আমি হারটা লুকিয়ে ফেললাম, কিছু না, তুমি যাও।

গোবর্ধন চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে নতুন চিন্তার উদয় হল। এতক্ষণ যা ভাবছিলাম, সবই বোধহয় ভুল। গোবর্ধনকে আমি ডাকিনি। তবে সে হঠাৎ নিজের থেকে এল কেন ? খাবারের কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে ? মিথ্যে কথা, এখনও তার সময় হয়নি। তবে কি সে লক্ষ্য করতে এসেছিল ঐ হারটা হাতে পাওয়ার পর আমার মধ্যে কোনরকম বৈলক্ষণ দেখা যায় কিনা।

কেন জানি না, আমার মনে হল সবাই মিলে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। গোবর্ধন হয়তো জানত ঐ ডালিয়ার টবের রহস্যের কথা। বরাবরই সে আমার ওপর নজর রেখেছে, আজ যখন তার কাছ থেকে খুন্তি চেয়ে নিয়েছি, পেছন পেছন এসে হয়ত দূর থেকে দেখেছে। সে হয়ত নিজের বুদ্ধিতে চলছে না, চালাচ্ছে মুরারী-মাস্টার। সে আমাকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়াতে চায়।

কিন্তু কেন ?

এ কেনর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। হয়ত আমরা কেউ না থাকলে ওদের সুবিধে হয়, এ বাড়ির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ওরা উপভোগ করে।

যতদূর সম্ভব মনের জোর করলাম, ভয় আমি পাব না সে যত রকমই ওরা চেষ্টা করুক না কেন। আশ্চর্য, মনের জোর করার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ভেতরে অসাধারণ শক্তি অনুভব করলাম। আর মনে হল না আমি একা, মনে হল না বড় অন্ধকার, বড় নির্জন এই বাড়ি। মনে হল না প্রেতাত্মাদের অলৌকিক শক্তির কথা।

সে রাত্রে আমি নির্ভয়ে ঘুমালাম। গোবর্ধনকে জানিয়ে দিলাম তাকে আর আমার পাশের ঘরে শুতে হবে না, সে যেন নিজের ঘরেই শোয়। এখন ভয় আমার তাকেই, ভূতকে নয়। যদি সে কোনরকমে অনিষ্ট করার চেষ্টা করে। স্থির করলাম, এবপর থেকে তাকে আমায় চোখে চোখে রাখতে হবে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে মনে হল আমি নতুন মানুষ। কাজ করার প্রচুর উদ্যম, বাইরে থেকে তিন চারটে কুলি ডেকে এনে বাড়িটাকে নতুন করে সাজাতে লেগে গেলাম। খুলে ফেললাম জানালার নীলরঙের পর্দাগুলো, হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকল আলোর বন্যা। ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল এতদিনের রহস্যভরা পরিবেশ। যে সব আসবাবপত্র দেখলে ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি মনে জেগে উঠত, তাদের সরিয়ে দিলাম পেছনের একটা গুদোমঘরে। স্মৃতিভারে পড়ে থাকলে তো চলবে না, মানুষের মত বেঁচে থাকতে হবে। বসবার ঘরের বেতের চেয়ারগুলো বার করে দিলাম বাইরের বারান্দায়। লতাপাতা-কাটা সোফাসেটের কভার খুলে ফেলে তার ওপর সযত্নে মুড়ে দিলাম বিছানার রঙীন চাদর। ফুলদানি স্থানান্তরিত হল। মাঝখানের ঘরে উঁচু টেবিলের ওপরে থাকত প্রমীলার মা-বাবার একটি যুগ্ম ছবি, কি জানি, কোনদিনই ও ছবিটা আমার ভাল লাগত না। কিন্তু প্রমীলা থাকতে বরাবর এ ছবিতে মালা দিত। সন্ধ্যার সময় ধুনো জ্বালিয়ে আরতির ভঙ্গীতে হাত নাড়ত।

আজ যখন সে ছবি সরাতে গেলাম, গোবর্ধন আপত্তি তুলল,—ও ছবিটা সরাবেন না জামাইবাবু।

গোবর্ধন যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আমি বুঝতে পারিনি। কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

—ও ছবি এখানে বরাবর আছে। জানেন তো দিদিমণি কত ভালবাসতেন।

বিরক্তভাবে বললাম, সে আমি বুঝব, তোমাকে বক বক করতে হবে না।

গোবর্ধন মুখ নীচু করে চলে গেল। বুঝতে পেরেছে আর আমাকে কোন কথা বলে লাভ হবে না। আমি ওদের মতলব ধরে ফেলেছি। এ বাড়িতে আর আমি কোনরকম পুরোন স্মৃতি রাখতে দেব না। প্রয়োজন হলে নতুন করে এ বাড়ি আমি রঙ করাব, পুরোন আসবাব নীলামে বিক্রী করে কলকাতা থেকে হালফ্যাশনের জিনিস আনাব। দেখি, এরা আমাকে ভয় দেখাতে পারে কিনা।

তুপুরবেলা বেরিয়ে বাজার থেকে বেশী পাওয়ারের ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ কিনে আনলাম। যে ঘরে আগে একখানা আলো ছিল সেখানে তু'খানা আলো লাগালাম। সন্ধ্যার পর এ বাড়ি উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে হেসে উঠল। খুশী হয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসলাম।

গোবর্ধন এসে একবার জিজ্ঞেস করলে, সব আলোগুলোই কি জ্বলবে ?

বিদ্রূপভরে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, কেন? তাতে কি তোমার কাজের অসুবিধে হচ্ছে ?

—তা নয়, মিছিমিছি অনেক খরচা হবে।

ওর ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হলাম, সেটা আমি বুঝব।

যদিও গোবর্ধন মুখে বললে, হুজুরের যেরকম মর্জি, কিন্তু মনে

হল সে যেন চোখদুটো ছোট ছোট করে আমার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে।

অধৈর্য স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কি, মুরারী-মাস্টারের সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল ?

ধরা পড়ে গেছে দেখে গোবর্ধন আর লুকোবার চেষ্টা করলে না, বললে, হ্যাঁ।

—কোথায় ?

—বাজারে। আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

এবার আমি ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছি—ওঁকে বলেছ নতুন করে বাড়ি সাজাচ্ছি ?

—বলেছি।

—কি বললেন ?

—কিছু বলেন নি, তবে শুনে খুব খুশী হলেন।

—ঠিক আছে, খাবার হয়ে গেলে খবর দিও। আজ আমি এই বারান্দাতেই খাব। খাবার-ঘরটাকে বদলাব ভাবছি।

—আপনার যেরকম ইচ্ছে,—বলতে বলতে চলে গেল গোবর্ধন।

আমার মনের মধ্যে একটা উল্লাস অনুভব করলাম। গোবর্ধন আর মুরারী-মাস্টারের মুখদুটো কল্পনায় ভেসে উঠল। একেবারে শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে গেছে। আর প্রমীলার প্রেতাত্মা নিয়ে খেলা করার সুযোগ ওরা পাবে না। আমার যে মনের জোর এতখানি, তা ওরা বুঝতে পারে নি।

সেইদিন থেকে বাড়ির আবহাওয়া পালটে গেল, ফিরে এল জীবনের সাড়া। এই ক'মাস ধরে এরা করে তুলেছিল এ বাড়িটাকে একটা

স্মৃতিমন্দির। আবার আমি সেখানে ফিরিয়ে আনলাম আলো-হাওয়ায়-ভরা চমৎকার বাংলোর রূপ। এখন আবার আগের মত এ বাড়িতে থাকতে আমার ভাল লাগে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব দু-চারজন যাঁরা এখানে আসেন তাঁরাও আসতে শুরু করলেন। অনেকদিন পরে পাগ্‌মিল রোডের বাংলোয় ফিরে এল স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ।

শুধু যে আমি বাড়িটাকেই বদলালাম, তা নয়। সেই সঙ্গে দমে পড়া নির্জীব মনটাকে সতেজ করে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। ভারমুক্ত প্রমীলা যখন এখানে নেই, স্মৃতিভারে আমিই বা দুর্বল হয়ে পড়ে থাকি কেন ?

রোজই সকাল-বিকেল বেড়াতে শুরু করলাম। আমার গাড়ি ছোট, তার ওপর অনেকদিনের পুরোন, বেশী দূরে যাবার উপায় ছিল না। হয় ক্যানারী পাহাড়, না হয় লেক, কিংবা হাজারীবাগ রোড আর রঁাচীর রাস্তায় খানিকটা গিয়ে ফিরে আসা। আমার সঙ্গে থাকত লিলি, বৌদি আর বিমলেন্দুদা। কিন্তু কাঁহাতক আর একই জায়গায় ঘোরা যায়! লিলি একদিন বলে ফেললে, এর চেয়ে বাড়ি বসে তাস খেলা ভাল।

আমি বললাম, এ জায়গাগুলো কিন্তু আমার কাছে পুরোন হয় না। কতবার তো এসেছি, তবু যেন চিরনূতন।

লিলি হেসে বলে, আপনি কবি হলে পারতেন।

—কেন ? আমাকে দেখে কি ঠিক কবি বলে মনে হয় না ?

লিলি উৎসাহিত স্বরে প্রশ্ন করে, সত্যি আপনি কবিতা লেখেন নাকি ?

গম্ভীর গলায় বললাম, কবি হলেই যে লিখতে হবে তার তো কোন মানে নেই। আমি নীরব কবি।

বৌদি প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন,—প্রতুল ঠাকুরপো ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছে। ঠিক আমি যেরকম নীরব গায়িকা।

বিমলেন্দুদা দুষ্টুমি করে ফোড়ন কাটলেন—তাহলে তো আমরা বেঁচে যেতাম—

—তার মানে, আমি বুঝি খুব চেঁচাই?

—আমি কি তাই বলেছি! তবে প্রতুল, তোমার বৌদির গানের চোটে ক্যানারীর জন্তুগুলো এদিকে আসতে সাহস করে না।

বিমলেন্দুর কথার ধরনে আমরা হেসে ফেললাম, বৌদিও হাসলেন। তবে স্বামীকে ভয় দেখাতে ছাড়লেন না—বলি তাহলে, বাসরঘরে তুমি কি গান করেছিলে?

দাদা কপট ভয়ে শিউরে উঠলেন, এই রে, তোমার মুখ খুললে আর রক্ষে আছে? বিশেষ করে এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে। চল, চল, ও-ঘরে চল, দরকারী কথা আছে। একরকম বৌদিকে টানতে টানতেই বিমলেন্দুদা পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তাদের হাসির আওয়াজ কানে ভেসে এল।

বললাম, দাদা-বৌদি দিব্যি আছেন কিন্তু। বরাবরই দেখছি হাসি-ঠাট্টা হৈ-হৈ করে দিন কাটিয়ে দেন।

লিলি সায় দিয়ে বলে, দিদি যা-ও বা মাঝে মধ্যে রেগে যায়, জামাইবাবু যেন মাটির মানুষ। দেখলে কেউ বুঝতে পারে যে ওদের পনের বছর বিয়ে হয়েছে?

শুনে আশ্চর্য হলাম, এতদিন?

—নিশ্চয়। উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে দিদির বিয়ে হয়, আমি তখন ছ-সাত বছরের মেয়ে, সবে ইস্কুলে ঢুকেছি।

হেসে বললাম, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ।

লিলি মুখ তুলে তাকাল,—বয়সটা বলে ফেললাম বলে বুঝি?

—কেন, তোমার কথা আমার মনে নেই ? প্রথমবার আমি যখন এখানে আসি, তুমি তখন পাটনা থেকে একটা সাইকেল নিয়ে এসেছিলে। শালোয়ার-কামিজ পরে সারাদিন সাইকেল চড়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে। মনে পড়ে সে-কথা ?

—মনে পড়বে না ? বাবাঃ, কাছারীর সামনে সেই খানায় পড়ে গিয়েছিলাম, আপনি তখন সাইকেল-রিক্সা করে ফিরছিলেন।

বললাম, ভাগ্যিস সেদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল, তোমাকে সাইকেল-রিক্সায় তুলে বাড়ি পাঠিয়ে আমি সেই ভাঙা সাইকেলটা মেরামত করতে দোকানে দিয়ে এলাম।

আর একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেয়ে গেল। কিছুতেই চাপতে পারলাম না। লিলি বোধহয় বুঝতে পেরেছিল কি কথা, তবু জিজ্ঞেস করলে, হাসছেন যে ?

বললাম, মনে পড়ে, তুমি আমায় পেয়ারা ছুঁড়ে মেরেছিলে ?

পুরোন দিনের কথা ভেবে লিলিও লজ্জিত হয়,—কি যে বলেন আপনি, গাছের ওপরে বসে পেয়ারা খাচ্ছিলাম, না দেখে নীচের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছি, সেটা যে আপনার গায়ে গিয়ে লাগবে, আমি কি করে জানব ?

—কি করে বুঝব যে তুমি আমায় দেখনি ?

—বা রে, মিথ্যে কথা বলব কেন ? লিলি আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। সহজ, সরল দৃষ্টি। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ও মুখ নামিয়ে নিল। কথার রেশটা কেটে দিতে ইচ্ছে করল না। বললাম, পরের বার তোমাকে দেখে কিন্তু আমি চমকে উঠেছিলাম।

—কেন ?

—তখন আর শালোয়ার-পরা কিশোরী নও, পুরোদস্তুর মেয়ে।

তখন নীল রঙের ওপর ছিল তোমার দুর্বলতা। বাজার থেকে যত রাজ্যের নীল শাড়ি এনে জড় করেছিলে।

লিলি হেসে বলে, সত্যি তখন কি ছেলেমানুষ ছিলাম। যখন যে খেয়াল মাথায় চাপত। আপনি আমাকে ক্ষেপাবার জন্যে নাম দিয়েছিলেন নীলা।

এ কথাটা অবশ্য আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তবু সেকথা প্রকাশ না করে বললাম, লিলির চেয়ে নীলা কিন্তু অনেক সুন্দর নাম।

বৌদি ভেতর থেকে লিলিকে ডাকলেন, সে সাড়া দিয়ে উঠে যাচ্ছিল। আমি বললাম, একটা ভাল গাড়ি জোগাড় করার চেষ্টা করছি, তাহলে অন্তত একটু দূরে দূরে যাওয়া যাবে।

শুনে লিলি খুশী হল। বললে, শুনছি ন্যাশনাল পার্কটা খুব সুন্দর হয়েছে, আমার দেখাই হয় নি।

বললাম, গাড়ি পেলে সব জায়গায় যাওয়া যাবে।

—আমি বলেছি বলে মিছিমিছি কষ্ট করবেন না।

বললাম, কষ্ট ভাবছ কেন, আনন্দও তো হতে পারে।

জানি না কি ভাবে আমি কথাটা বলেছিলাম। লিলি কিন্তু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে হাসলাম। লিলিও হাসল। বড় মিষ্টি লাগল ওর হাসি।

অমলেন্দু হাজারীবাগে থাকলে গাড়ি জোগাড় করার কোন অসুবিধেই ছিল না। এখানে তার অনেক বন্ধু। আমার সেরকম পরিচিত লোক এখানে নেই। আগে কতবার এসেছি, কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে আসতাম। এবার ঠিকই করে এসেছিলাম, এখানে বেশীদিন থাকব না। তাই গাড়িও আনি নি। এখন মনে

হচ্ছে একটা ভাল গাড়ি পেলে মন্দ হয় না! ভেবে দেখলাম, এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন একমাত্র উমেশ মল্লিক। তিনি নামকরা উকিল, হয়তো চেষ্টা করলে মক্কেলদের কাছ থেকে গাড়ি পেতে পারেন।

সেইদিনই বিকেলবেলা উমেশ মল্লিকের বাড়ি গেলাম। উনি অফিস-ঘরে কাজ করছিলেন, আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন। ইতিমধ্যে দু-চারবার ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আদালতে যে দরখাস্ত দেবার কথা, তার পাকা খসড়া হয়ে গেছে। শীঘ্রই সে হাঙ্গামা চুকে যাবে। এ বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে আসিনি, তা যেন উমেশবাবু বুঝতেই পেরেছিলেন। আপ্যায়িত করে বললেন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি স্বয়ং আমার বাড়িতে এলেন।

বললাম, মিছিমিছি লজ্জা দেবেন না।

—এ পাড়ায় বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি?

—না, আপনার কাছেই আসছি।

উমেশবাবু আরও খুশী হলেন, সত্যি? বলুন কি সেবা করতে পারি?

কথার ধরনে হেসে ফেললাম, বেশ কথা বলেন আপনি, অদ্ভুত বিনয়।

উমেশবাবুও হাসলেন, আমরা জাত-বোষ্টম কিনা।

মামুলী কথাবার্তার পর গাড়ির প্রশ্ন উঠল। যা ভেবেছিলাম তাই। উমেশ মল্লিক সাগ্রহে বললেন, এ আবার কি কথা, আপনার গাড়ির দরকার আগে বলেন নি? কবে চাই বলুন?

—ইচ্ছে ছিল একবার ন্যাশন্যাল পার্কে যাবার।

—নিশ্চয় যাবেন। কাল গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

—বললাম, কাল না পরশু।

—খুব ভাল কথা, কোন সঙ্কোচ করবেন না। যেদিন গাড়ি দরকার গোবর্ধনকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে দেবেন। সকাল থেকে আমার গাড়ি আপনার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে।

সঙ্কোচ বোধ করলাম: সে কি, আপনি নিজের গাড়ি ছেড়ে দেবেন, কাজের অসুবিধে হবে যে!

উমেশ মল্লিক শব্দ করে হাসলেন। আপনিও যেমন, উকিলরা গাড়ি রাখে কি নিজের জন্যে? দেখুন না, সারাদিনই প্রায় গ্যারেজে পড়ে থাকে, আমি তো ঘুরে বেড়াই সাইকেল-রিক্সায়। মক্কেলদের দরকারের সময় গাড়িটা পাঠিয়ে দিতে হয়। অতএব আপনার সঙ্কোচের কিছু নেই। মনে করবেন, এ আপনারই গাড়ি।

এত সহজে ব্যবস্থা হয়ে যাবে ভাবিনি। উমেশবাবুর অনুরোধমত সেদিন ঐখানেই লুচি-তরকারি খেয়ে আসতে হল, উনি কিছুতেই ছাড়লেন না। প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ওনার সঙ্গে বকর বকর করতে হল। পাগ্‌মিল রোডের বাংলোকে দুঃস্থ, নারীদের আশ্রমে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব উনি আবার পেশ করলেন। স্মরণ করিয়ে দিলেন কলকাতার জমির কথা, নারকোলডাঙার দক্ষিণে যা জলের দরে বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, এখন আমার কি ইচ্ছে, এখুনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি কিনা।

বললাম, এসেই যখন পড়েছি, ভাবছি কিছুদিন এখানে থেকেই যাই।

উমেশ মল্লিক বললেন, খুব ভাল কথা। আপনারও একটা চেঞ্জ দরকার হয়েছিল।

—তা সত্যি। শরীর যেন আর বইছিল না। অফিস থেকে আর পনের দিনের ছুটি নিয়েছি।

—প্রথমদিন আপনার চেহারা দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল, এখন আপনাকে অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

উমেশ মল্লিকের কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম তখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে।

এরপর ক'দিন বেশ হৈ-হৈ করে কাটল। উমেশ মল্লিক তাঁর কথা রেখেছেন। খবর পেয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন গাড়ি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ড্রাইভার। গাড়ি যে খুব নতুন তা নয়। বছর সাত-আটের পুরোন হিন্দুস্থান, কিন্তু চড়লেই বোঝা যায় খুব যত্ন করে গাড়ি রাখা হয়েছে। বডিতে কোথাও এতটুকু শব্দ নেই।

গাড়ি করে ঘুরে বেড়াতে হলে হাজারীবাগের চেয়ে ভালো জায়গা আমার জানা নেই। হাজারীবাগ রোড আর রাঁচীর রাস্তার কথা বলছি না। যাঁদের গাড়ি করে বেড়াবার শখ, তাঁরা কোন-না-কোন সুযোগে এ রাস্তা দিয়ে ঘুরে এসেছেনই। শুধু ঘুরে এসেছেন বললে ভুল হবে, বার বার ঐদিকে যাবার জন্যে তাঁরা উন্মুখ হয়ে থাকেন। বিদেশ থেকে যাঁরা দেশ-ভ্রমণে আসেন, তাঁদের মুখেও এ রাস্তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রচুর সুখ্যাতি শুনেছি। কিন্তু এগুলো তো পোশাকী রাস্তা, বাস ও লরি চলাচল করছে অনবরত। এছাড়া যে নির্জন রাস্তা ক্ষীরগাঁও শ্মশান ছাড়িয়ে ছাতরা পর্যন্ত চলে গেছে, তার সৌন্দর্যও বড় চমৎকার। যদি অত দূরে যেতে ইচ্ছা না করে, বুচারটোলীর রাস্তা ধরে এগিয়ে ডান দিকে চলে গেলে বড়কাগাঁও। আগে যখন শিকার করতে যেতাম, এ পথে কতদিন গেছি। রাতের অন্ধকারে স্পটলাইট জ্বালিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে থাকতাম। হঠাৎ কোন বন্য জন্তুর জ্বলজ্বলে চোখ দেখতে পাওয়ার আশায়। এই

শিকারের ঝোঁকই টেনে নিয়ে গেছে ধান্নুয়া-ভান্নুয়ার ডাকবাংলোয়। এ সব রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে আরাম, দীর্ঘপথ দ্রুত অতিক্রম করে চলে যায়।

ডি. ভি. সি-র কল্যাণে এ সমস্ত অঞ্চলটাই আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। মাইথন, বোখারো আর ভিলাইয়ার বাঁধ পরিদর্শন করতে আসেন দেশ-বিদেশের মহামান্য অতিথিরা। বেড়াতে আসেন বিভিন্ন প্রদেশের শহরবাসী। সত্যিই এসব জায়গা দেখে আনন্দ হয়। মনে হয় আমরা কিছু কাজ করছি, আমাদের দেশ এগুচ্ছে। ভাল লাগে এখানকার কর্মব্যস্ততা, নতুন কিছু করার জন্যে মানুষের লড়াই। নদীর স্বাভাবিক গতিকে এরা বন্ধ করেছে, জল থেকে উৎপন্ন করছে বিদ্যুৎ, এখানে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। পাওয়ার স্টেশনে ঘর্ঘর শব্দের মধ্যে দাঁড়ালে অনেকের কানে তালা ধরে যায়। কিন্তু আমার শুনতে ভাল লাগে। হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি আনন্দের উল্লাস।

লিলির মত সব বিষয়ে উৎসাহী, চঞ্চল মেয়েও এই সব প্রকাণ্ড যন্ত্রের কাছে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলে বিরক্ত হয়। বলে, আপনি তো আচ্ছা লোক, ওই ঘরের মধ্যে ঢুকে আর বেরোবার নাম নেই। উঃ, কী বিশ্রী শব্দ! কিছুক্ষণ শোনার পর মনে হচ্ছিল মাথার মধ্যে কারা যেন হাতুড়ি-পিটছে।

ওর ছেলেমানুষী কথা শুনে হাসি পেল। বললাম, এখানে এলে আমি সব ভুলে যাই। অবাক হয়ে দেখি যন্ত্রের মহিমা। কত সহজে একটা জিনিসকে এরা বদলে দেয়।

—যাই বলুন, যন্ত্র বড় নির্দয়।

—বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়।

লিলি তখনও জোর দিয়ে বলে, যন্ত্র অস্বাভাবিক।

পাছে তর্ক হয় বলে আর কোন উত্তর দিলাম না। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

—এরচেয়ে ঢের ভাল ন্যাশন্যাল পার্ক।

ইচ্ছে করে হার স্বীকার করে বললাম, বেশ, তোমারই জিত হল। এর পরের দিন ন্যাশন্যাল পার্কেই যাব।

ন্যাশন্যাল পার্কে বেড়াতে যেতে সকলেরই ভাল লাগে, বিশেষ করে মেয়েদের। এ এক বিরাট সুরক্ষিত জঙ্গল। জন্তু-জানোয়াররা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনুপতিপত্র না নিয়ে কেউ এখানে শিকার করতে পারে না। এখানে বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, হরিণ আছে, আছে আরও নানা রঙের পশু আর পাখী। গাড়ি করে যেতে যেতে হয়তো চোখে পড়ে নীলগাই, কিংবা সাদা পেখম-ধরা ময়ুর। তারাও সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে গাড়ির দিকে, নির্ভয় সে চাহনী।

আমার হাত নিশ-পিশ করে। বলে ফেলি, সঙ্গে যদি একটা বন্দুক থাকত—

বৌদি থামিয়ে দেয়, ভাগ্যিস নেই, তাহলে হাতে হাতকড়া পড়ত।

বললাম, তা জানি। কিন্তু কি করব বলুন, শিকার করতে যে বড় ভাল লাগে। হত যদি একটা সাধারণ জঙ্গল।

লিলি বাইরের দিকে তাকিয়ে জঙ্গল দেখছিল। বললে, তার চেয়ে এ ঢের ভালো। কপালে থাকলে হয়তো বাঘ-ভাল্লুকও দেখা যেতে পারে।

না বলে থাকতে পারলাম না।—তার জন্যে তো কলকাতার

চিড়িয়াখানা রয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে পশুরাজ্য তদারক করা হয়ে যাবে।

বিমলেন্দুদারও আমার কথা খুব মনঃপূত হল না। এ তুমি অন্যায় বলছ প্রতুল। জঙ্গলের মধ্যে এদের যেরকম দেখতে লাগে, তা কি তুমি চিড়িয়াখানায় পাবে? সেই যে কে লিখেছিলেন বন্যেরা বনে সুন্দর—

হেসে ফেললাম, আসল কথা বলুন না। ভয় নেই বলে বন্য সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন। রাতদুপুরে জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাল্লুকের সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হলে বুঝতাম তাকে সুন্দর বলতে পারেন কিনা।

ভেবেছিলাম, এবার আর কেউ আমার কথার উত্তর দিতে পারবে না। আমার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাসও প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বৌদি উত্তর দিলেন, যত পারো আমাদের কাছে বড়াই করে নাও, ঠাকুরপোর কাছে তো শুনেছি, সত্যিকারের বাঘ দেখে তোমার মুখ কিরকম কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ে গেল উড়িষ্যার জঙ্গলের কথা। অমলেন্দুর শিকারের দলের সঙ্গে আমিও ছিলাম। যে জঙ্গলে আমাদের মাচা বাঁধার কথা, শুনলাম তারই কাছের এক গ্রামে কিছুদিন ধরে বাঘের উৎপাত শুরু হয়েছে। সঙ্গে বন্দুক আছে দেখে গ্রামবাসীরা আমাদের ধরে নিয়ে গেল। তার আগের দিন রাত্রে বাঘ একটা গরু মেরে রেখে গিয়েছিল, গ্রামের সীমানা পেরিয়ে জঙ্গলের আওতায়। কাছাকাছি একটা বড় গাছের ওপর মাচা বানিয়ে আমরা ওৎ পেতে বসে রইলাম। ভেবেছিলাম, যদি সে বাঘ আবার আসে তবে গভীর রাত্রেই আসবে। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল হল। সে এল

সন্ধ্যের মুখে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। কোন দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে গরুটার কাছে দাঁড়াল। তার শিকারের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে গরুটার বুকের ওপর থাবা রেখে হাঁটু গেড়ে বসল। আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখছিলাম তার রাজকীয় চেহারা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার বুক, তার মাথা। অমলেন্দু আমাকে সুযোগ দিয়েছিল প্রথম গুলি ছোঁড়বার জন্যে, কিন্তু আমি পারলাম না। কেন জানি না আমার হাত কেঁপে উঠল, মনে হল আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব। আমাকে দেরি করতে দেখে অমলেন্দু এক গুলিতে বাঘটাকে মেরে ফেললে। কেন যে সেদিন আমি গুলি ছুঁড়তে পারলাম না, আজও তার কোন পরিষ্কার কারণ আমি খুঁজে পাই না।

অমলেন্দু বলেছিল, তোর মন দুর্বল। আমি অনেককে দেখেছি শিকারের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ভয় পেয়ে যায়। হয়তো তাদের পাখী মারার টিপ খুব ভাল, কিন্তু বাঘ-ভাল্লুকের বেলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আমার মনে হয় মৃত্যুভয় তাদের বড় বেশী।

বলা বাহুল্য, অমলেন্দুর কথা আমি স্বীকার করিনি।

এক সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রত্যেকদিনই উমেশবাবুর গাড়ি নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়িয়েছি। কোন কোনদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বাইরে কাটান হত। টিফিন ক্যারিয়ার করে বৌদি সঙ্গে নিতেন লুচি আর আলুর দম। আমি বাজার থেকে কিনে আনতাম কচুরী সিঙ্গাড়া আর মিষ্টি। সারাদিন হৈ হৈ করে সন্ধ্যের পর ক্লান্ত দেহে বাড়িতে ফিরে আসা হত। আবার মাঝে মাঝে বেরুনো হয়েছে, দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর। খাওয়ারও কোন ঠিক থাকত না,

কোনদিন বা বিমলেন্দুদার বাড়ি, কোনদিন বা আমার বাংলোয়। গোবর্ধনকে দিয়ে যে কটা ভাল পদ রাঁধানো সম্ভব তা তৈরী করাতাম। বাকী খাবার অর্ডার দিয়ে করিয়ে আনতাম পাঞ্জাবী হোটেল থেকে।

লিলি আমার পরিবেষণ করা দেখে বলত, আমার জামাইবাবুর মত অনেককে দেখেছি যারা সংসারের জন্যে কাঠি ভেঙে কুটোটি করতে পারেন না। আপনি কিন্তু সে জাতের লোক নন, একেবারে পাকা গিন্নী।

বিমলেন্দুদা খেতে খেতে আপত্তি তুলেছেন, প্রতুলের সুখ্যাতি কর ঠিক আছে, কিন্তু তার জন্যে আমার বদনাম কোর না। তোমার দিদিটিকে তো চেন না, কাউকে কিছু করতে দেবে না।

বৌদি বঁটীতে আম কাটছিলেন, বললেন, তাহলেই হয়েছিল আর কি, মাসকাবারি বাজার তিনদিনে ফাঁকা হয়ে যেত। বিষয়-সম্পত্তির হিসেবই রাখতে পারেন না তো বাড়ির হিসেব।

হেসে বললাম, আমার কিন্তু বরাবর সব কাজ নিজে করা অভ্যেস। ছোটবেলা থেকে একলা থাকতে ভাল লাগত, বাবা মাকে ছেড়ে মামার বাড়ি, মাসীর বাড়ি চলে যেতাম। নিজের জামাকাপড় ঠিকমত রাখা, জুতো পরিষ্কার করা, শরীর বুঝে চলা—এ ছিল আমার স্বভাবের মধ্যে। মনে আছে অন্য ছেলেদের বাবা মা-রা বলত, প্রতুলকে দেখে শেখো। ওর মত স্বাবলম্বী হও।

লিলি হেসে জিজ্ঞেস করে, মনে মনে নিশ্চয় খুব গর্ব হত আপনার?

—হত না বললে মিথ্যে বলা হবে। যত বড় হলাম কাজ করার নেশা ততই বেড়ে গেল, অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে, যখনই কোথাও শিকারে যাওয়া হত, চা করা থেকে শুরু করে খিচুঁড়ি রাঁধা পর্যন্ত সবই আমি করতাম।

বৌদি সায় দিয়ে বললেন, তা আর আমার মনে নেই, প্রতুল ঠাকুরপো যখনই বেড়াতে আসত, সব সময় ওর সঙ্গে থাকত দুটো ব্যাগ। একটাতে শিকারের সরঞ্জাম আর একটায় হাড়ি, ডেক্‌চি, স্টোভ, কতরকম জিনিস।

—এখনও তো আমায় ট্যুরে ঘুরে বেড়াতে হয়, কিন্তু কোন অসুবিধে হয় না। যে কোন ডাকবাংলোয় উঠে পড়ি। সেখানে খানসামা থাক না থাক আমি নিজেই দিব্যি চালিয়ে নিতে পারি। এর মধ্যে একটা আনন্দ আছে।

লিলি টিপ্পনী কাটে, যেমন চড়ুইভাতি করার আনন্দ।

জোর দিয়ে বললাম, ঠিক তাই। একঘেঁয়ে-ডাল-ভাত খাওয়া জীবনটা আমার কাছে অসহ্য।

গোবর্ধন রান্নাঘর থেকে আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছিল, বললে, জামাইবাবু তো এ বাড়ীতে প্রত্যেকদিন সকালবেলা উঠে স্টোভ ধরিয়ে চা করতেন, দিদিমণি উঠতেন দেরী করে।

বললাম, শুধু চা কেন গোবর্ধন, আগে মাংসও কি কম রেঁধেছি!

—তা সত্যি। জামাইবাবু মুসলমানদের মত মুরগী রাঁধতে পারেন।

লিলি হাসতে হাসতে বলে, এরপর দেখছি আপনার সঙ্গে রান্না নিয়ে আর কথা বলা যাবে না। গোবর্ধনের কাছ থেকেও যখন সার্টিফিকেট পেয়েছেন।

এ'কদিন শুধু যে ঘোরা হল তাই নয়, তারই মধ্যে দিয়ে বিমলেন্দুদাদের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার বিয়ের পর থেকে ওদের সঙ্গে আলোপটা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে

এসেছিল, দেখা-সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে হলেও মুখের আলাপের বেশী আর কোন সম্পর্ক তখন রাখতে পারি নি। এবারের নিঃসঙ্গ হাজারীবাগে ওদের সকলকেই বড় আপনার জন বলে মনে হল। বিশেষ করে লিলি, সে যেন আমার চোখে এক নতুন বিস্ময়। ছেলেবেলাকার সেই চঞ্চলা লিলি আর নেই, তার ধীর স্থির কথাবার্তা, সমবেদনাভরা চাহনি, উদ্ভিন্নযৌবনা রূপ আমাকে মুগ্ধ করে। আমার মনে হয় আমি কখন ওদের বাড়ি যাব, লিলি তার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। কথায় প্রকাশ না করলেও চোখে মুখে সে-খুশীর ব্যগ্রতা আমি লক্ষ্য করেছি। আমার কথা সে মন দিয়ে শোনে। মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা করলেও, আমার একলা জীবনটার কথা ভেবে সে কাতর হয়। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলেও বুঝতে পারি লিলি তার বড় বড় চোখ দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে, আমাকে মুখ ফেরাতে দেখলে অতি সন্তর্পণে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়।

আমার জানতে ইচ্ছে করে লিলি আমার সম্বন্ধে কি ভাবে। খোলাখুলি তার সঙ্গে কোন কথাই এ পর্যন্ত আমার হয়নি, তাই বোধহয় অজানাকে জানবার এত আগ্রহ।

সেদিন কি বার মনে নেই, আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম হাজারীবাগ রোডের রাস্তায়, ইচ্ছে ছিল দেরী করে বাড়ি ফিরব। গোবর্ধনকে বলেও গিয়েছিলাম তাই, কিন্তু রাস্তায় হঠাৎ বৌদির শরীরটা খারাপ হওয়ায় আমরা সন্ধ্যে না নামতেই ফিরে এলাম। ওদের বাড়িতে নামিয়ে যখন নিজের বাংলোয় ফিরে এলাম তখন সবেমাত্র রাস্তায় আলো জ্বলেছে।

আমার গাড়ি বাড়িতে ঢুকতে দেখে মনে হল কারা যেন বাইরের বারান্দা থেকে চট করে সরে গেল। আশ্চর্য লাগল, এ সময় কারা ওখানে দাঁড়িয়েছিল! গাড়িটা গ্যারেজে তুলে দিয়ে দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম, উঠোনের কাছেই গোবর্ধনের সঙ্গে দেখা হল। উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম, এখুনি কারা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল? আমাকে দেখে পালিয়ে গেল।

গোবর্ধন কানের পাশটা চুলকে বললে, আমি ছিলাম হুজুর।

বিস্মিত হলাম, তুমি একা?

—না, মুরারীবাবু এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে, তাই বলছিলাম আপনার ফিরতে দেরী হবে।

—আমাকে দেখে সরে গেলে কেন?

গোবর্ধন এতটুকু না ঘাবড়ে বলল, আপনার গাড়ি দেখে ছুটে এলাম, খিড়কীর দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখতে।

কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, মুরারী-মাস্টার কোথায়?

—বাইরের বারান্দায়।

আর কোন কথা না বলে আমি চললাম মুরারী-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে। নিশ্চয় ওরা কোন গোপন পরামর্শ করছিল, জানত আমি এখন বাড়ি ফিরব না, হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে কি মিথ্যা কথা বলবে বুঝে উঠতে পারছে না।

মুরারী-মাস্টারের স্পর্ধা দেখে আরও আশ্চর্য হলাম। সেই প্রথম কথা বললে, বাড়িটাকে তো একেবারে ঢেলে নতুন করে সাজিয়েছেন দেখছি।

শুকনো হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কেন, তাতে কি আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে?

—তা নয়, তবে অনেক বছর ধরে এ বাড়ির চেহারা

একরকম দেখে আসছি, হঠাৎ বদলে গেলে একটু অন্যরকম লাগে বৈকি।

মুরারী-মাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে এতটুকু ভাল লাগছিল না। সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, প্রমীলা পরলোক থেকে আবার আপনার কাছে খবর পাঠিয়েছে নাকি?

মনে হল আমার কথা শুনে মুরারী-মাস্টার বিরক্ত হল। বললে, না, এমনি এসেছিলাম খবর নিতে। সেদিন ডালিয়ার টবের ভেতরে কিছু পেয়েছিলেন নাকি?

কেন জানি না সত্যি কথা বলতে ইচ্ছে করল না। বললাম, কই কিছুই তো পেলাম না। ভেবেই রেখেছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা হলে একদিন জিজ্ঞেস করব।

আমার এ উত্তর শুনে মুরারী-মাস্টার চিন্তিত হয়ে পড়ে, তার কপালে পরিষ্কার ফুটে ওঠে বঙ্কিম রেখা। বাধ বাধ গলায় প্রশ্ন করে, সত্যি বলছেন?

আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল, বেশ চেঁচিয়ে বললাম, তার মানে, আমি কি মিথ্যাবাদী?

—তা নয়, কিন্তু প্রমীলা যে বলল—

আরও বিরক্ত হয়ে বললাম, ওসব বুজরুকি ছাড়ুন, মানুষ মরে গেলে তার আর কিছু থাকে না, মৃত্যুই হল এ জীবনের শেষ। তার পরের সব কথা হল বানানো গল্প, আমাদের মনের কল্পনা।

মুরারী-মাস্টার তখনও বক বক করে, তাহলে সেই যে চিঠিটা পেলেন?

আমার মধ্যে থেকে কে যেন হিংস্র পশুর মত চীৎকার করে উঠল, সে আপনাদের কারসাজি। আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা, ওসব বদ্‌বুদ্ধি ছাড়ুন। আর আমার ত্রিসীমানায় আসবেন না।

মুরারী-মাস্টার আগেই চেয়ার থেকে উঠে পড়েছিল, তীক্ষ্ণ চোখে আমার মুখটা দেখবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ পেছু ফিরে হন হন করে নেমে চলে গেল।

আমার মনের কথাগুলো যে আজ স্পষ্ট ভাষায় ওকে জানিয়ে দিতে পেরেছি তা ভেবেই বড় আনন্দ পেলাম। বুঝলাম, আমি জিতেছি।

কিন্তু বিস্মিত হলাম পরদিন সকালবেলা। সবেমাত্র খবরের কাগজ হাতে চা খেতে বসেছি, এমন সময় বৃদ্ধ বিজনবাবু এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। প্রমীলার মামা বিজন সান্যাল। তাঁকে সাইকেল রিক্সা থেকে নামতে দেখে আমি তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গেলাম। বিনয় করে বললাম, আপনি কেন কষ্ট করে নিজে এলেন! খবর পাঠালেই তো আমি যেতাম দেখা করতে।

উনি কিন্তু চট্ করে কোন কথা বললেন না, বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, তোমার শরীর ভাল আছে তো?

বললাম, কই, আমার তো কিছু হয় নি।

দেখেই বুঝলাম বিজনবাবু খুব অবাক হয়েছেন, নিজের মনেই বিড় বিড় করে বললেন, তাহলে যে আমাকে বললে—

কথাবার্তার ধরনে আমারও কেমন সন্দেহ হল, জিজ্ঞেস করলাম, কে বলেছে আপনাকে আমার শরার খারাপ?

—কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, কাল তোমার কাছে কি মুরারী এসেছিল?

এবার বুঝতে পারলাম, এ মুরারী-মাস্টারের কাণ্ড। ভূতের

ব্যাপারে আমাদের কাছে সুবিধে করতে না পেরে এখন অন্য কোনরকম ফন্দী আঁটছে। একটু কঠিন স্বরেই বললাম, ও লোকটাকে আমার খুব সুবিধের মনে হয় না। এর ওর কাছে বড় মিথ্যেকথা বলে বেড়ায়।

বিজনবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন,—তাই নাকি, অথচ লোকটাকে তো ভাল বলেই জানতাম। তবে কিছুই অসম্ভব নয়, এটা যে জ্বলজ্যান্ত মিথ্যে তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার শরীর খারাপ বলে আমায় ভয় দেখিয়ে দিল!

রেগে বললাম, যাব আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে।

—না, না, থাক। হ্যাঙ্গামা না বাড়ানোই ভালো। কার কি মতলব কে জানে। সাবধানে থেকো।

বলতে বলতেই সাইকেল রিক্সায় উঠে বৃদ্ধ চলে গেলেন। আমিও বারান্দায় ফিরে এলাম। ভাবছিলাম মুরারী-মাস্টারেরই কথা, কি সাংঘাতিক লোক। অথচ ওকেই আমি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম আর কি। প্রমীলার জন্যেও দুঃখ হল, বেচারী একেবারে লোক চিনতে পারত না।

আবার সাইকেল রিক্সার শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকালাম। বিজনবাবু ফিরে এসেছেন।

—কি ব্যাপার? কাছে এগিয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ এসে আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন,—তোমাকে দু' একটা কথা বলে যাই। জানি না তুমি কি মনে করবে, তবু আমার বলা দরকার।

—বলুন।

ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আবার তুমি বিয়ে কর।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না,—কি বলছেন!

—অনেক ভেবেই বলছি, তোমার বয়েস অল্প, সমস্ত জীবনটা পড়ে রয়েছে। একলা থেকে কোন লাভ নেই, কোন সুখ নেই। সে একটা অস্বাভাবিক জীবন। যদিও প্রমীলা আমার ভাগ্নী, খুব আদরের ভাগ্নী, তবু ভগবান যখন তাকে কাছে টেনে নিলেন, আমি তো বলব বিয়ে তোমার করা উচিত। নিজেই ভেবে দেখো।

উত্তরের জন্য কোন প্রতীক্ষা না করে বৃদ্ধ গিয়ে আবার সাইকেল রিক্সায় বসলেন। আমার দিকে ফিরে হাসলেন।

বৃদ্ধ চলে গেলেন বটে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন এক নতুন চিন্তা। আবার বিয়ে করার কথা আমি এ পর্যন্ত কল্পনাও করিনি। ধরেই নিয়েছিলাম প্রমীলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। অন্য কারুর মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনলে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের চিন্তাকে আদৌ প্রশ্রয় দিতাম কিনা জানি না। কিন্তু প্রমীলার মামা হয়েও বিজনবাবু যে উপদেশ দিয়ে গেলেন তা মন থেকে কিছুতে সরিয়ে ফেলতে পারলাম না।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে গেলাম লিলির সঙ্গে একলা কথা বলার। সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা করে ছিল, সারাদিন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়েছে। বিকেলের দিকে আমার ছোট গাড়ি নিয়ে বেরোলাম। ভেবেছিলাম অমলেন্দুদের বাড়ি যাব, তবে একটু পরে। কাছারি রোড দিয়ে খানিকটা এগিয়েছি, দেখি উল্টো দিক থেকে মাথায় একটা ছোট ছাতা দিয়ে লিলি আসছে। কচি

কলাপাতা রঙ-এর শাড়িতে তাকে মানিয়েছে বড় চমৎকার। ওর কাছে গিয়ে গাড়ি থামালাম।

—কোথায় যাচ্ছ ?

লিলি হেসে বললে, বিশেষ কোথাও নয়, এমনি একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।

বললাম, যদি আপত্তি না থাকে গাড়িতে এলে খুশী হব। একসঙ্গে বেড়ান যাবে।

—আপনি যে হাঁটতে চান না।

হেসে বললাম, বেশ, তোমার খাতিরে আজ না হয় হাঁটবো।

—তাহলে আপত্তি নেই।

দরজা আগেই খুলে দিয়েছিলাম, লিলি আমার পাশে এসে বসল। অনির্দিষ্টভাবে কিছুক্ষণ গাড়ি চালালাম, কাজিন্‌স্‌ গ্রাউণ্ডের পাশ দিয়ে গেলাম কলেজের দিকে। আকাশ এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে, মনে হয় না আর বৃষ্টি নামবে। একটু এগিয়েই বাঁদিকে ঢুকলাম কাঁচা রাস্তায়, সোজা গিয়ে যেটা মিলেছে ক্যানারী পাহাড়ের সঙ্গে। এ রাস্তাটি আমার বড় প্রিয়, প্রমীলাকে নিয়েও বহুবার এ রাস্তায় বেড়াতে এসেছি। লাল রাস্তা, দুপাশে শাল আর মহুয়ার ছোট ছোট গাছ, দূরে ক্যানারী পাহাড়। তারও পেছনে নীল আকাশ। দেখতে দেখতে মন যেন কত দূরে চলে যায়। এক সময়ে বললাম, কদিন বড় আনন্দে কাটল, এবার আবার ফিরতে হবে কলকাতায়। কর্মব্যস্ত কলকাতা।

লিলিও কি ভাবছিল, আমার কথা শুনে ওর চিন্তার সূত্র কেটে গেল। বললে, কলকাতা তো আপনার ভালই লাগে।

—মোটেও না। তবে আজ ওখানে, যেতেই হবে। অবশ্য

আমার পক্ষে সবই সমান। সবাই যখন হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায়, আমি থাকি নির্জন ঘরে বসে।

—কেন, কারও সঙ্গে মিশতে আপনার ভাল লাগে না?

ম্লান হাসলাম, আগে তো অনেক মিশেছি, এখানেও কি তোমাদের সঙ্গে কম ঘুরলাম!

—তবে?

—মনের মত সঙ্গী কোথায় পাব? আমাদের দেশে বিপত্নীকের জীবন বড় অদ্ভুত। আমরা না মিশতে পারি ব্যাচেলারের দলে, না যেতে পারি বিবাহিত সমাজে। যাদের অবশ্য ছেলেমেয়ে থাকে তাদের অন্য কথা। আমার পক্ষে এ নির্জনবাস।

লিলি সমবেদনা প্রকাশ করে, সত্যিই বড় অস্বাভাবিক জীবন।

গাড়ির গতি মন্থর করে নিয়ে বললাম, তাইতো কলকাতায় ফিরতে বিশ্রী লাগছে। এই কমাসে আমাকে যেন পঙ্গু করে দিয়েছিল, হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিল বয়েস। ভাগ্যিস হাজারীবাগে এসেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাই পায়ের তলায় আবার মাটি অনুভব করতে পারছি।

দুজনেই কিছুক্ষণ কোন কথা বললাম না। গাড়ি এগিয়ে চললো। কাছেই ক্যানারী। হঠাৎ কথা বললে লিলি, তার কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনাল, যদি কিছু না মনে করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম।

—বিয়ে করে কি আপনি সুখী হয়েছিলেন?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম, এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

উত্তর দিতে গিয়ে উত্তেজনায় লিলির গলা কেঁপে ওঠে, হয়ত আমার

বোঝবার ভুল, দিদিদের মুখে সব সময়ই শুনি আপনারা ছিলেন আদর্শ সুখী দম্পতী। কিন্তু আমার তা বিশ্বাস হয় না, মনে হয় আজও আপনি যেরকম একা, বিয়ের পরও ঠিক সেই রকমই ছিলেন। প্রমীলা আপনাকে বুঝতে পারেনি।

লিলির কথা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আশ্চর্য, আমার মনের কথা তুমি কি করে জানলে

লিলি হাসল, কিন্তু সে হাসিতে কোন শ্লেষ নেই,—আমি যে সাইকোলজির ছাত্রী।

ক্যানারী পাহাড়ে ঢুকে ডানদিকের রাস্তা ধরলাম। খানিকটা এগিয়ে নজরে পড়ল একটা নির্জন বেঞ্চি। কতকগুলো সিঁড়ির ওপরে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধান। চারদিকে গাছ, বড় মিষ্টি পরিবেশ। এ জায়গাটাও আমার পরিচিত। লিলিকে নিয়ে ওপরে উঠে বসলাম। সামনের একটা ডাল থেকে নাম-না-জানা লাল ফুল নুয়ে পড়েছিল। লিলি সেটা ছিঁড়ে নিয়ে খোঁপায় গুঁজল।

কাছেই কোন গাছের মধ্যে খড়মড় করে শব্দ হল, লিলি সেইদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কিসের শব্দ ?

বললাম, বোধহয় বুনো মুরগী, গাছের ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

—আপনি তো বেশ শব্দ শুনেই বুঝতে পারেন !

হেসে বললাম, পশুপাখীর বেলা ঠিকই বুঝতে পারি, বুঝতে পারি না শুধু মানুষকে। তুমি তখন কথা তুললে বলেই বলছি, প্রমীলাকে বিয়ে করে সত্যি আমি ভুল করেছিলাম। ওর সঙ্গে কোন মিলই আমার ছিল না। প্রমীলার কতকগুলো মেয়েলী গোঁ ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা সে ছাড়তে পারেনি।

—হাজার হোক ছেলেমানুষ মেয়ে তো।

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল, বললাম, আমারই ভুল হয়েছে।

পাহাড়ে আলো জ্বলতে শুরু করল। আমরাও নেমে এসে গাড়িতে উঠলাম। ঠিক ক্যানারীতে ঢোকবার মুখে একটা ছেলেমেয়েদের খেলবার পার্ক নতুন তৈরী হয়েছে। আমি আগে এটা দেখিনি, বললাম, এইখানে বোধহয় চিড়িয়াখানা তৈরী হবে।

—কে বললে আপনাকে ?

—গোবর্ধন বলছিল। গিরিডীতে একটা বাঘ ধরা পড়েছিল, সেটাকেও বুঝি এখানেই কোন একটা খাঁচায় রেখেছে।

লিলি হেসে ফেললে, আপনি কতদিনকার পুরোন কথা বলছেন, জানেন না সে বাঘটা পালিয়েছে ?

—সে কি, কবে ?

—দিন পাঁচেক আগে। থাবা মেরে একটা কাঠ সরিয়ে শিক-দেওয়া দরজা খুলে সে পালিয়েছে। এখনও ধরা পড়েনি।

গম্ভীর গলায় বললাম, এ কথা তোমার আগে বলা উচিত ছিল। এতক্ষণ ঐ নির্জন পাহাড়ে বসে থাকা মোটেই ঠিক হয়নি।

লিলি খিলখিল করে হাসে, বাঘ বুঝি আপনার জন্যে ক্যানারী পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে, সে কোন বনের মধ্যে পালিয়েছে কে জানে।

সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে বার বার শুধু লিলির কথা মনে হয়েছে। আজকে তার মধ্যে আমি দেখেছি একটা স্বতন্ত্র রূপ। অনুভব করেছি নারী-মনের চিরন্তন কৌতূহল। আজ তার কথায়, ভাবে, ভঙ্গীতে আমি খুঁজে পেয়েছি সেই চিরকেলে মেয়েকে, যে

ভালোবেসে অন্যের দুঃখের বোঝা হাসিমুখে নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়। আজ লিলিকে যেরকম সুন্দর দেখাচ্ছিল, আগে সেরকম কোনদিন দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলার কথাও মনে পড়েছে। প্রমীলা ছিল ছেলেমানুষ, উচ্ছ্বাসভরা তার কথাবার্তা। কিন্তু লিলি অনেক বেশী সংসারে অভিজ্ঞ, প্রত্যেকটি কথা তার ওজন করা। প্রমীলার চেহারায় ছিল পুরুষকে আকর্ষণ করার শক্তি, কিন্তু লিলির সৌন্দর্য মনে প্রশান্তি এনে দেয়। নিজেরটুকু ছাড়া প্রমীলা আর কিছু বোঝবার চেষ্টা করেনি, মনে হয় না লিলির মধ্যে সে স্বার্থপরতা আছে।

বহুক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েছি, আর চিন্তা করেছি নিজের জীবনের কথা। যদি আবার বিয়ে করতেই হয়, তাহলে কিন্তু ভুল করলে চলবে না। ভেবে দেখলাম লিলির মত মেয়েই আমার সত্যিকারের জীবনসঙ্গিনী হতে পারে।

পরদিন সকাল সকাল গিয়েছিলাম লিলির সঙ্গে দেখা করতে, যদি তার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে পারি তারই আশায়। সুযোগও মিলল। বৌদিরা বেরিয়ে গেলেন কাদের বাড়ি নিমন্ত্রণ রাখতে। বাড়িতে রইলাম আমি আর লিলি, কিন্তু কথা মোটেই জমতে পারল না। আজ এসে থেকেই দেখেছিলাম লিলির কেমন যেন অন্যমনস্ক চেহারা। বিহ্বল তার চাহনী।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে লিলি ?

লিলি কথা লুকোবার চেষ্টা করল, কিছু হয়নি তো।

—তবে তোমায় এত শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

—সে বোধহয় আজ বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি বলে।

আমি ইচ্ছে করেই বললাম, জানো লিলি, কাল সারারাত আমি তোমার কথাই ভেবেছি। সন্ধ্যেবেলাকার তোমার কথাগুলো বার বার আমার মাথায় এসেছে। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, আমার জীবনের মূল সুরটা তুমি ধরিয়ে দিতে পেরেছ।

মনে হল লিলি আমার একটা কথাও শুনছে না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম, সত্যি বল তোমার কি হয়েছে?

লিলি একদৃষ্টে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল, বললে, আজ আমি বড় অদ্ভুত রকমের একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি এই খাটটায় শুয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হল সামনের দরজাটা কে ঠেলছে। আমি বোধহয় জিজ্ঞেস করলাম, কে? কেউ উত্তর দিল না। ভাবলাম, এ হয়ত আমার মনের ভুল। কিন্তু একটু পরেই খুব আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটি মেয়ে ভেতরে এসে দাঁড়াল। যেন সদ্য স্নান করে উঠেছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়ানো, পরণে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। আমি তাকে আগে কখনও দেখিনি। ঐভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমায় কিছু বলবেন? ভদ্রমহিলা কোন উত্তর দিলেন না, স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হল কি যেন বলতে চান অথচ পারছেন না। মুখখানি ঢলঢলে ছবির মত, চোখে করুণ মিনতি। বিছানা ছেড়ে উঠে তার কাছে যেতে যাব, কোথায় যেন বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল সে মেয়েটি।

লিলির কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম সে প্রমীলাকেই স্বপ্ন দেখেছে। মনে মনে আশ্চর্য হলাম এই ভেবে, যাকে সে চোখে দেখেনি, স্বপ্নে দেখল কি করে? এও কি সম্ভব হয়?

মনের ভাব গোপন করে হেসে বললাম, একটা স্বপ্ন নিয়ে এত কথা ভাবছই বা কেন ?

লিলি অন্যমনস্ক স্বরে বলে, তা নয়, এত জীবন্ত স্বপ্ন আমি খুব কম দেখেছি। ঠিক মনে হয়েছিল মেয়েটিকে যেন আমি চোখের সামনে দেখছি।

সেদিন অনেকক্ষণ আমরা একসঙ্গে ছিলাম বটে কিন্তু ঐ প্রসঙ্গের পর আর কিছুতেই যেন অন্য কথা চললো না। শুনলাম লিলির বাবা আসছেন, শীঘ্রই, হয়ত আগামী কাল। কিছুদিন এখানে থেকে লিলিকে পাটনায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।

বৌদিরা ফিরে আসা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করলাম না। সোজা বাড়ি চলে এলাম। আজ মনে অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, লিলির কাছে সব কথা খুলে বলব। সুযোগ পেয়েও বলা হল না, মনটা বিরক্তিতে ভরে গেল। কে জানে আবার কবে সুযোগ আসবে, আবার কবে বলতে পারব।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। অন্যদিন যাও-বা বই পড়ি, আজ তাও ইচ্ছে করল না। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল ঘরের মধ্যে কারুর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। বিছানার ওপরে উঠে বসলাম, সারা শরীর আমার ঘামে ভিজে গেছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নিবিড় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ?

দরজার কাছ থেকে স্পষ্ট উত্তর এল, আমি।

এ কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত, বুকটা ধড়াস করে উঠল। তবু জিজ্ঞেস করলাম, কে তুমি ?

আবার সেই একই গলার উত্তর, চিনতে পারছ না, আমি প্রমীলা।

অনুভব করলাম, আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, কোন রকমে বালিশটা আঁকড়ে ধরলাম, বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কি চাও তুমি ?

—তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটিয়ে দিতে চাইবে তা আগে বুঝতে পারি নি। আসতে হল তোমাকে সাবধান করে দিতে।

—তার মানে ?

—মাস্টারমশাইকে সেদিন তুমি মিথ্যে কথা বলে অপমান করলে কেন ?

থতমত খেয়ে গেলাম,—মুরারী-মাস্টারকে আমার ভাল লাগে না।

—আমি তাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

রেগে গিয়ে বললাম, তুমি তো জান আমি পরলোকে বিশ্বাস করি না ?

—এখন বিশ্বাস করছো তো ?

কিছু উত্তর দিতে পারলাম না।

শুনতে পেলাম প্রমীলা হাসছে, বললে, লিলির কাছে আমি নিজেই গিয়েছিলাম, ও স্বপ্ন দেখেনি।

—সে কি ?

—যদি বিশ্বাস না হয় আলো জ্বাললেই আমায় দেখতে পাবে।

কথা শুনে শিউরে উঠলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি তোমায় দেখতে চাই না, তুমি চলে যাও।

কিছুক্ষণের জন্যে ঘরে কোন সাড়া নেই। জমাট অন্ধকারের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ভাবলাম একবার চিৎকার করে গোবর্ধনকে ডাকি। পারলাম না, গলা আমার শুকিয়ে গেছে।

—কেন তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে?

প্রমীলার কণ্ঠস্বর এবার ভেসে এল আমার পিছন থেকে। চমকে উঠে ঘুরে বসলাম।

—তুমি আমায় কোনদিন ভালবাস নি, বিয়ে করেছিলে সম্পত্তির লোভে, সব তো পেয়েছো, আর বেশী লোভ কোর না। তাহলেই ধরা পড়ে যাবে।

আমি একটি কথারও উত্তর দিলাম 'না, সবটুকু শক্তি সঞ্চয় করে মনে মনে প্রার্থনা করলাম প্রমীলা এখান থেকে চলে যাক। বোধহয় সে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল, বললে, আমি এখন যাচ্ছি, বড় কষ্ট হচ্ছে এখানে থাকতে। দরকার হলে আমি আবার আসব। মা বাবার ছবিটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে গেলাম, তুমি আর সরাবার চেষ্টা কোর না। ওঃ—

স্পষ্ট শুনতে পেলাম কান্নার শব্দ, নারীকণ্ঠের করুণ বিলাপ। আস্তে আস্তে সে শব্দ মিলিয়ে গেল, দূরে—অনেক দূরে। মনে হল, ঘরের অস্বাভাবিক জমাট অন্ধকার যেন তরল হয়ে এসেছে। বাইরের জানালার দিকে ফিকে আলো ঢুকছে। আমি আবার সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলাম। ঐভাবে বসে বসেই বাকী রাতটুকু কেটে গেল, এতটুকু নড়তে সাহস হল না। শুনতে পেলাম বাইরে পাখীরা ডাকছে। ভোরের আলো ক্রমশঃ জোর হয়ে উঠছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকে আমার সমস্ত শরীরে যেন হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। আস্তে আস্তে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এতক্ষণ প্রচণ্ড উত্তেজনার বশে সমস্ত শিরা-উপশিরা কঠিন হয়ে

ছিল, ক্রমশ শিথিল হয়ে এল। ক্লান্তিতে, অবসাদে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গল অনেক দেরীতে। গোবর্ধন নাকি দুবার এসে ডাকাডাকি করেছিল, কোন সাড়া পায়নি। বেলা দশটা নাগাদ প্রায় একরকম সে ঠেলেই আমায় তোলে। জিজ্ঞেস করে, আপনার শরীর খারাপ হয়নি তো হুজুর ?

তখনও আমার চোখ থেকে ঘুমের ঘোর কাটেনি। প্রশ্ন করলাম, কেন ?

—গা গরম মনে হচ্ছে।

ওর কথা শুনে কপালে, মাথায়, মুখে হাত ঘষলাম, গরম কিনা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সমস্ত শরীরে একটা জ্বালা অনুভব করলাম। পিঠের শিবদাঁড়ার কাছটা কনকন করছে, চোখ খুলে পরিষ্কার করে তাকাতে পারছিলাম না।

গোবর্ধন বললে, আমি বাইরের বারান্দাতেই জল, দাঁত-মাজন নিয়ে আসছি, এখানে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

ওর কথা মত বারান্দাতে মুখ ধুয়ে ফেললাম। বললাম, গোবর্ধন, একটু গরম চা নিয়ে এস, আমি এখানে বসছি। ভাবলাম, গরম চা খেলে হয়ত শরীরটা ঝরঝরে লাগবে।

ইজিচেয়ারে বসতেই কালকের রাত্রের ভয়াবহ স্মৃতি মাথার মধ্যে ভীড় করে এল। সত্যিই কি কাল আমি প্রমীলার কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম, না সে শুধু স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নই বা দেখব কেন ? প্রমীলা যা বলে গেল সেগুলো কি আমার অবচেতন মনের কথা ? কাল যখন লিলি বলেছিল সে লালপাড় শাড়ি-পরা একটি মেয়েকে স্বপ্ন দেখেছে, তখনই

আমি মনে মনে প্রমীলার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। হয়ত রাত্রে ঘুমোবার পর সে কথা আমার স্মরণে ছিল তাই স্বপ্নে তার কণ্ঠস্বর শুনেছি। কিন্তু এগুলো যদি আমার অবচেতন মনেরই কথা হয় সেও তো কম ভয়াবহ নয়।

আর ভাবতে পারলাম না, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করলাম। গোবর্ধন যখন চা নিয়ে এল তার দিকে তাকিয়ে কোনরকমে বললাম, আমার বিছানাটা একটু ঠিক করে দাও, আমি আবার শুয়ে পড়ি, শরীরটা কিরকম করছে।

গোবর্ধন ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কিছু খাবেন না জামাইবাবু?

—না।

—মামাবাবুকে খবর দেব?

—না।

—তাহলে?

—একজন ডাক্তার ডেকে আনো।

—ঠিক আছে, আমি রায়বাবুকে এখুনি খবর দিচ্ছি।

গোবর্ধন আমাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডাকতে চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে এপাশ ওপাশ করলাম। মাঝে মাঝে বোধহয় কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম। যেটুকু সময় জেগে ছিলাম, কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেছে, বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি।

ডাক্তার রায় এসে পরীক্ষা করে বলে গেলেন, বিশেষ ভাবনার কিছু নেই, তবে খারাপ জাতের ফ্লু, হয়ত কয়েকদিন ভোগাবে। প্রেসক্রিপসান লিখে কোন ওষুধটা কখন খাওয়াতে হবে বুঝিয়ে দিলেন গোবর্ধনকে। রোজই সকালবেলা এসে উনি একবার করে আমায় দেখে যাবেন, তবে প্রয়োজন বোধ করলে আমি যেন ওঁকে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা না করি।

এরপর থেকে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা যে আমার কি ভাবে কেটেছে তা খেয়াল নেই। বেশীক্ষণই বোধহয় ঘুমিয়ে ছিলাম, চোখ খুলতে সব সময় কাছে দেখেছি গোবর্ধনকে। কয়েকরকম ওষুধ এক একসময় আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে, আমি বিনা আপত্তিতে খেয়ে নিয়েছি।

মাঝে মাঝে শীত করছিল খুব, যখনই আমি হাতড়াতে শুরু করেছি, গোবর্ধন সযত্নে কম্বলটা আমার গায়ে চাপা দিয়ে দিয়েছে।

আজ সকাল থেকে অনেকটা ভাল। হরলিক্‌স্ আর বিস্কুট খেয়ে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছি, মনে হল উঠোনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন কার সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনলেও ঠিক কে বুঝতে পারলাম না। মনটাকে একাগ্র করার শক্তি এখনও নেই।

একটু বাদে লিলি এসে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে সত্যি খুশী হলাম, বোধহয় হাসলামও।

লিলি অভিযোগ জানাল, এ আপনার কি অন্যায় বলুন তো? অসুখে ভুগছেন একটা খবর পর্যন্ত পাঠালেন না?

বললাম, কি হবে তোমাদের সবাইকে বিরক্ত করে?

লিলি অসন্তুষ্ট হল,—এতদিন একসঙ্গে হৈ হৈ আনন্দ করলাম অথচ অসুখের সময় আমাদের ডাকতে চাইলেন না, বুঝতে পারছি কত পর মনে করেন আমাদের।

শুকনো হাসলাম, দোষ ঠিক আমার নয়, বলতে গেলে এ দুদিন বেহুঁস হয়েই পড়ে ছিলাম।

—আমরা তো অবাক, আপনার কোন খবর নেই, এদিকে বাবা এসেছেন। আপনার কথা ওঁর কাছে কত বলেছি, অথচ আলাপ করাতে পারছি না।

আবার যেন চোখটা ভারী হয়ে আসছে, লিলিকে বললাম, দেখ তো গা-টা গরম কিনা?

লিলি আমার কপালে হাত দিল, চিন্তিত স্বরে বলল, হ্যাঁ, এ তো বেশ জ্বর। ওর হাতের শীতল স্পর্শ ভাল লাগল, বললাম, তোমাকে খবর দিতে পারতাম কিনা জানিনা, তবে এটুকু জেনো, তুমি এসেছ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। এ কথার লিলি কোন উত্তর দিল না, তবে আমি লক্ষ্য করলাম তার গালে রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে।

লিলি গোবর্ধনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিলে, কখন কোন ওষুধ আমায় খেতে হয়, ডাক্তার কি পথ্যি করতে বলেছে, জ্বরের চার্ট লেখবার জন্যে চেয়ে নিলে একটা খাতা আর কলম, আমার সঙ্গে একটাও কথা না বলে সে পরিচর্যার সব রকম তদারক করছিল গোবর্ধনের সঙ্গে। আমি নীরবে লক্ষ্য করছিলাম। গোবর্ধন চলে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কি হচ্ছে?

লিলি হেসে পালটা প্রশ্ন করলে, কেন বুঝতে পারছেন না। গোবর্ধনকে ধমকে যে সময়মত তেঁতো ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে যাবেন তা চলবে না।

বললাম, ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে আমি কিন্তু খুব সুবোধ বালক।

—সে দেখাই যাবে। লিলি কি যেন ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনার বোধহয় মনে মনে একটু ভয় ঢুকেছে, না ?

—কিসের ভয়?

—আমি যদি রোজ নার্সিং করতে আসি তখন পাছে লোকে কিছু বলে।

কথার উত্তর না দিয়ে হাসলাম।

লিলি হাসতে হাসতে বল্‌ল, ভয় নেই, আমি একলা আসব না। দিদিদেরও ধরে আনব।

লিলি যা বলে দেখলাম তা সে করেই। সেদিন থেকে আর আমাকে একলা থাকতে হয়নি। যখনই ঘুম ভেঙেছে দেখেছি, কেউ না কেউ মাথার কাছে বসে রয়েছেন। দিনের বেলা বিমলেন্দুদা, বৌদি আর লিলি পালা করে আমাকে পাহারা দিত, আবার অনেক সময় বিশেষ করে বিকেলের দিকে সকলে মিলে একসঙ্গে বসে গল্প করা হোত। রাত্রিবেলা যাতে গোবর্ধন সব সময় আমার কাছে থাকে তার বেশ কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল লিলি।

দুদিন একলা নির্জনে অসুখের যন্ত্রণা ভোগের পর এই অভাবনীয় পরিচর্যার ঘটা দেখে মনে মনে খুব যে খুশী হয়েছিলাম বলতে পারি না, তবে ভাল লাগত যতক্ষণ লিলির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতাম। এই অসুখের মধ্যে না পড়লে আমি বোধহয় বুঝতেই পারতাম না মাত্র এই ক' সপ্তাহের মধ্যে লিলি আমার মনের কতখানি অধিকার করে ফেলেছে।

সকাল থেকেই আমি উন্মুখ হয়ে বসে থাকি কখন সে আসবে, কখন তার সঙ্গে আমার কথা হবে।

সেদিন বিকেল বেলা জানালা দিয়ে দেখলাম আকাশে নানা রঙের ঘনঘটা। বুঝলাম আকাশের এ চেহারা বেশীক্ষণ থাকবে না। সূর্যদেব যে দিনগুলোয় যাই যাই বলেও বিদায় নিতে পারেন না, শুধু সেই দিনগুলোতেই লাজুক পৃথিবীর মুখে ফুটে উঠে রক্তিমাভা হয়তো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু নিঃসন্দেহে তা অবিস্মরণীয়।

লিলি জানালা দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল।

তবু জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখছ ?

লিলি না ফিরে উত্তর দিলে, আকাশ।

বললাম, আমিও তাই দেখছি, কিন্তু সেইসঙ্গে তোমার মুখখানাও।

এবার লিলি আমার দিকে তাকাল।

বললাম, রোজই ভাবি অনেকগুলো কথা তোমাকে বলব, কিন্তু বলতে পারি না। ভয় হয় পাছে তুমি আমায় ভুল বোঝ, বিরক্ত হও। কিন্তু আজকের এই পরিবেশে কথা বলতে বেশ ভাল লাগছে।

একটু থামলাম, যদি লিলি কোন উত্তর দেয়। কিন্তু না। সে আগের মতই চুপ করে রইল, মাথাটা নীচু করে। তবে বুঝলাম মন দিয়ে কথা শুনছে। আগের মতই গম্ভীর গলায় বলে চললাম, তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব জানি না, সত্যিই, তুমি এসে না পড়লে এ অসুখ থেকে বোধহয় উঠতে পারতাম না। শুধু যে শরীরটাই বিগড়েছিল তাতো নয়, মনটা গিয়েছিল একেবারে ভেঙ্গে। আমি যে কতখানি একা তা তুমি ধারণা করতে পার না।

কথাগুলো বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে ওঠে।

লিলি সহানুভূতি-ভরা গলায় বলে, আমি সব বুঝি, আপনারা মুখে যতই বলুন না কেন একলা কিছুতে থাকতে পারবেন না।

উদাস কণ্ঠে বললাম, বিয়ের কথা বলছ, বলা খুব সহজ। দেখেছ তো আমার স্বভাব, নিজের খেয়াল খুশীর ওপর চলি, কোন মেয়ে আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে চাইবে ? বিয়ে আমার কাছে আতঙ্ক. আর একটা ভুল করা মানে জীবনের কত বড় ট্রাজেডী।

লিলি প্রতিবাদ করে বললে, ভুল যে করবেনই তা স্থির ভেবে নিচ্ছেন কেন? দেখেশুনে নিজের পছন্দমত বিয়ে করলে এত ভাবনার কি আছে।

না হেসে পারলাম না,—বেশ কথা বললে যা হোক, ধর পছন্দ না হয় আমি কাউকে করলাম, কিন্তু সে মেয়ে আমাকে গ্রহণ করতে রাজী হবে কেন? প্রথমতঃ আমি বিপত্নীক, তার ওপর বয়েস হয়ে গেছে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লিলি বলে, বিয়ের ব্যাপারে ওই দুটোই বোধহয় চরম কথা নয়, দুজনের মনের মিলটা হচ্ছে আসল। আর সব আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

লিলির কথার মধ্যে কি ছিল জানি না, এতক্ষণের সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে স্পষ্ট ভাষায় বলে ফেললাম, যদি বলি তোমাকেই আমার পছন্দ, তাহলে কি তুমি শিউরে উঠবে না?

লিলি পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম।

আপনাকে কিন্তু আমি আরও বেশি সাহসী মনে করেছিলাম। স্পষ্টভাবে এ কথাটা জানাতে এত সঙ্কোচ বোধ করছেন কেন?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না, অনুভব করলাম আমার ধমনীতে রক্তের আনন্দোচ্ছ্বাস। চোখে জল এল, থামবার চেষ্টা করলাম না, দুর্বল হাত তুলে ধরে কাঁপা গলায় ডাকলাম, লিলি।

বিনা ভূমিকায় লিলি আমার কাছে এগিয়ে এল, হাতে হাত রাখল। আমি তার উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করলাম।

বাইরে অন্ধকার, ঘরের ভেতরেও আলো জ্বালার প্রয়োজন, দুজনের মুখেই কোন কথা নেই। এতদিনের অব্যক্ত কথা আজ পূর্ণতা লাভ করেছে বিরাট এক প্রতিশ্রুতির মাঝে।

এর পর সেরে উঠলাম খুব সহজে। ওষুধের চেয়ে সেবার দাম বেশি। লিলি তা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিল। আমাদের দেখে বাইরের লোক এখন কি ভাবছে জানি না, কিন্তু আমরা নিজেরা মহানন্দে বিভোর হয়ে আছি। এতদিন আমরা যেন একটা অন্ধকার ঘরে বসে কথা বলছিলাম। প্রেমের দেবতা সেখানে দীপ জ্বালিয়ে রেখে গেছে। তারি আলোয় আমরা উদ্ভাসিত, সকলের মধ্যে থেকেও আমরা স্বতন্ত্র। আবার একান্তে নির্জনে বসলেও মৌন সন্ধ্যার নীরবতা আমাদের স্পর্শ করতে পারে না, আমরা মুখর হয়ে উঠি। সেখানে রঙীন স্বপ্নের বুদবুদ ফোটে। আমি বলি, আমার মা, বোন এ বিয়ের কথা শুনলে যে কতখানি খুশী হবেন, তা তোমায় ভাষায় বোঝাতে পারব না। তোমার মত মেয়েই তাঁরা চান।

লিলি বলে, বিয়ে হবে পাটনায়।

বললাম, তাতো হবেই, তোমাদের বাড়ি যখন ওখানে। কিন্তু বৌভাতের হাঙ্গামা আমি বড় করে করবো না। নমো নমো করে কলকাতায় তার পালা চুকিয়ে মধুচন্দ্রিমায় সোজা চলে যাব কাশ্মীর।

লিলির চোখ দুটো নেচে ওঠে, সত্যি? জান, আমারও কাশ্মীরে যাবার খুব ইচ্ছে।

—তোমার কোন ইচ্ছেই আমি অপূর্ণ রাখব না।

কোন কথা মনে পড়ে যাওয়ায় লিলি মৃদু মৃদু হাসে, বলে, দিদি বোধ হয় কিছু আঁচ করেছে।

—কি করে বুঝলে?

—হেসে হেসে আমায় জিজ্ঞেস করছিল, এবার সম্বন্ধ করব কি না বল। বিয়েতে আর অমত নেই তো?

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, কিন্তু বৌদি বুঝতে পারল কি করে, তুমি কিছু বলেছ?

—না, আমি বলিনি, তবে মেয়েরা বুঝতে পারে।

সাবধান করে দিয়ে বললাম, কিন্তু এ নিয়ে যেন আর কোন কথা না ওঠে। পাটনায় গিয়ে আমি তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করব। সেখানেই সব কথা পাকাপাকি হয়ে যাবে।

দিন কয়েক আগে লিলির বাবা এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু এসেছিলেন অসময়ে। আমার তখন খুব জ্বর। তাই ভাল করে কথা বলতে পারিনি। লিলিকে বলে রেখেছিলাম ওঁকে আর একদিন নিয়ে আসবার জন্যে। ভাল করে চা খাওয়াব, গল্প করব।

সে কথা ওঠায় লিলি বলল, বাবা বলেছেন, কাল আসবেন, সকালের দিকে।

—উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম, খুব ভাল হল, তুমিও সঙ্গে থাকবে তো?

—হ্যাঁ, দুজনেই আসব।

বললাম, কদিনই তো জ্বরে শুয়েছিলাম, ভেতরের ঘরগুলো গোবর্ধন কি অবস্থায় রেখেছে কে জানে। চল একবার দেখে আসি।

এখনও শরীর বেশ দুর্বল। সবেমাত্র একদিন ভাত খেয়েছি, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথাটা ভোঁ ভোঁ করে।

লিলি বললে, নাঃ, গোবর্ধন তোমার কাজের লোক, কোন জায়গাটাই অপরিষ্কার করে রাখেনি।

হেসে বললাম, তাই দেখছি, অবশ্য জানি না এর পেছনেও তোমার তদারক আছে কি না।

—থাকলেও খুব সামান্য।

ড্রইংরুম পেরিয়ে মাঝখানের বড় ঘরে প্রবেশ করতেই আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। দেখলাম ঠিক আগের মত প্রমীলার বাবা-মার ছবি টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে। এ ছবি আমি নিজের হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে আমাদের আগেকার শোবার ঘরে বন্ধ করে রেখে এনেছিলাম। তবে সে ছবি এখানে এল কি করে!

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, জ্বরে পড়বার আগের দিন রাত্রে যে নারীকণ্ঠ আমি শুনেছিলাম, সে বলেছিল, মা বাবার ছবিটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে গেলাম, তুমি আর সরাবার চেষ্টা কোর না।

তবে কি সে কণ্ঠস্বর প্রমীলারই! সে-ই নিজে এ ছবি এখানে রেখে গেছে। আমি এতদিন ভাবছিলাম এ সবই আমার মনের ভ্রম। অসুস্থ শরীরে নিজের চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনেছি মাত্র। এ কদিনের মধ্যে ছবির কথা আমার মনে পড়েনি, তার ওপর অসুস্থ শরীরে সাতদিন প্রায় একটা ঘরে বন্দী ছিলাম। আজ এতদিন পরে অন্দর-মহলে ঢুকে ঐ ভয়াবহ ছবিটাকে স্বস্থানে দেখে নিজেকে শিশুর মত অসহায় বোধ করলাম।

লিলি আমার হাত দুটো ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে তোমার? ওরকম করে কি দেখছ?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, না, চল বাইরে গিয়ে বসি।

লিলির কাঁধে একটা হাত রেখে আস্তে আস্তে বাইরে এসে বসলাম। তখনও আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি।

লিলি উদ্বিগ্ন হয়, বল লক্ষ্মীটি।

বললাম, লিলি, এ বাড়িতে থাকতে আর আমার ভাল লাগছে না। আমি চলে যেতে চাই, যত শিগ্‌গীরি সম্ভব।

—কেন ?

—এ যেন একটা জাদুঘরের মধ্যে বসে আছি। শুধু অতীতের স্মৃতি। অসহ্য।

লিলি আমার কপালে হাত বুলিয়ে দেয়, বেশ তো, এখন শরীর ভাল হয়ে গেছে, কলকাতায় ফিরে যাও।

লিলির হাতটা ধরে ফেলে বললাম, তোমরা পাটনা যাচ্ছ কবে ?

—সোমবার, রাত্রের গাড়িতে।

—আজ শুক্রবার, শনি রোব দুদিন বাকী। সে অনেক দেরী, আমি আগে চলে যাব, তোমার সঙ্গে দেখা করব পাটনায়।

লিলি উত্তেজিত স্বরে বলে, তুমি কোন কথা লুকোচ্ছ, আমাকে বলতে চাইছ না। ঐ ছবিটাতে তুমি কি দেখছিলে ?

বলেই লিলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল বোধহয় আবার ছবিটা দেখতে যাবার জন্যে। আমি তাকে ধরে ফেললাম। চেঁচিয়ে বললাম, না, তুমি ওঘরে যেও না।

লিলি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, নিশ্চয় তোমার আবার শরীর খারাপ হয়েছে।

আপত্তি না করে বললাম, হ্যাঁ, আমার কষ্ট হচ্ছে, শুইয়ে দাও।

খাটে শুয়েও লিলির হাতটা আমি ছাড়িনি। মিনতিভরা গলায় বলেছি, তুমি আমাকে একলা রেখে যেও না। আমি অসুস্থ—

তখন থেকেই লিলি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। খুব বেশী কথা বলল না, যদিও তার কর্তব্যপালনে কোনরকম ত্রুটি হয় নি। সে বসে থেকে আমায় খাইয়েছে, ওষুধ দিয়েছে, প্রয়োজন বোধে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে গোবর্ধনকে বসিয়ে রেখে তবে বিদায় নিয়েছে।

ঘুমের ওষুধের জন্যেই বোধহয় রাত্রে নির্বিঘ্নে ঘুমিয়েছি। সকালবেলা উঠে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বলে নিজেকে মনে হল। কাল রাত্রে ঐ ছবিটা দেখে কেন যে অতখানি ভয় পেলাম তা আজ এই দিনের আলোর মধ্যে ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। কী জানি, লিলি আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছে। সারা বাড়িটা ঘুরে বেড়ালাম, ভালো করে আবার ছবিটা দেখলাম।

গোবর্ধনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ছবিটা তুমি এখানে নিয়ে এসেছো ?

সে অস্বীকার করলো, কৈ না তো।

—তবে কে নিয়ে এলো ?

—আমি তো ভেবেছিলাম, আপনি এনে রেখেছেন।

একবার মনে হল গোবর্ধনের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা না করলেই বোধহয় ভালো করতাম, তবে এ নিয়ে আর ভাববার অবসর পেলাম না, অল্পক্ষণের মধ্যে লিলি ও তার বাবা সুধাময়বাবু এসে হাজির হলেন।

আমি তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলাম। খাতির করে ড্রইংরুমে বসালাম।

সুধাময়বাবুর বয়েস পঞ্চাশের ওপর, বেশ লম্বা, ঋজু দেহ। দেখলে বোঝা যায় রঙ আগে খুব ফরসা ছিল এখন তামাটে, সামনের দিকের চুল উঠে গিয়ে প্রশস্ত ললাট, কিন্তু পুরু গোঁফ, চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা। চেহারার মধ্যে আভিজাত্য আছে, অথচ খুব হাসিখুশী মানুষ। গল্প শুরু করলে সহজেই পরকে আপন করে নিতে পারেন।

প্রথম চোটে আপনি সম্বোধন করলেও আপত্তি তোলায় বিনা দ্বিধায় আমায় তুমিত্বে বরণ করলেন। হেসে বললেন, কদিন তাহলে খুব ভুগলে।

বললাম, খারাপ টাইপের ফ্লু আর কি।

—আরো কদিন আছো?

—কাল পরশুর মধ্যেই যাবো ভাবছি।

—কলকাতায়?

সম্মতি জানালাম। সুধাময়বাবু মৃদু মৃদু হাসলেন,—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, দুদিন মায়ের রান্না ভাত পেটে পড়লে দেখবে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

লিলি ইতিমধ্যে উঠে ভেতরে চলে গেছে, বোধহয় গোবর্ধনের কাছে খবর নিচ্ছে আমি কাল রাত্রে কি রকম ছিলাম। সুধাময়বাবু একটা বর্মা সিগার বার করে ধরালেন, জিজ্ঞেস করলেন, খাবে নাকি?

হেসে বললাম, অভ্যেস নেই।

—এ কিন্তু তোমাদের সিগারেটের চেয়ে অনেক ভালো। আমি বাড়িতে খাই তামাক, বাইরে সিগার।

বুঝতে পারলাম শ্রোতা পেলে সুধাময়বাবু অনর্গল বকে যেতে পারেন। আমিও এ সুযোগ ছাড়লাম না। দু' একটা মামুলী উত্তর

দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোন কথা বললাম না। উনি বলে গেলেন ওঁদের বংশের কথা, বাড়ির গল্প, পাটনায় প্রবাসী জীবনের ইতিহাস। ওঁর বাবা শেষজীবনে অল্প পুঁজি নিয়ে তেলের রঙের ব্যবসা শুরু করেছিলেন পাটনায়, উনি তাকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কত বড় করেছেন তা বিশদভাবেই আমাকে শোনালেন। অবশ্য শেষে বললেন, আর নয়, এবার সব গোটাতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন ?

—বয়েস বেড়ে যাচ্ছে, ওপারে যাবার সময় এসে গেল বলে, কে তখন ব্যবসা সামলাবে। জান ত' আমার দুই মেয়ে। বড় জামাই বিমলেন্দু, ওর এদিকে কোন শখ নেই, ছোট মেয়ে লিলি এখনও বিয়ে করেনি। এসব মেহনতী ব্যবসা মেয়েদের পক্ষে চালানো সম্ভব নয়। তার চেয়ে এখনি এই চালু অবস্থায় ব্যবসা বিক্রী করে দিলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। রেখে দেব ব্যাঙ্কে, আমি মরে গেলে দুই মেয়ে সমান ভাগ পেয়ে যাবে।

এর মধ্যে আমার কথা বলার কোন দরকারই ছিল না, তবু বললাম, হ্যাঁ, বিক্রী করতে হলে এই সময়ে করা ভাল, সবচেয়ে বেশী দাম উঠবে। আর ব্যাঙ্কে টাকা থাকলে কত রকমেই তো ইনভেস্টমেণ্ট করা যায়।

—ন্যাশানাল বণ্ড ?

—না, আমি বলছিলাম সুবিধেমত ভাল জমি ধরে রাখতে পারেন।

—সন্ধানে আছে নাকি ?

বললাম, আমাদের অ্যাটর্নী বলছিলেন কলকাতায় নারকোলডাঙ্গার কাছে বেশ কিছু বিঘে জমি বিক্রী আছে। এখন সস্তায় যাচ্ছে, পরে ও অঞ্চলের দাম বাড়বে খুব।

ব্যবসায়ী সুধাময়বাবুর চোখদুটো চক চক করে উঠল,—পার ত' ভাই এর বিশদ বিবরণটি আমায় আনিয়ে দাও। বরাবরই শখ আছে, কলকাতায় কিছু প্রপার্টি কেনার।—

ঠিক এই সময় লিলি ভেতর থেকে ঘুরে এল। তাকে দেখে সুধাময়বাবু উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, জানিস লিলি, প্রতুল বলছে কলকাতায় কিছু ভাল জমি আছে ওর সন্ধানে, ও আমাকে খবর দেবে।

লিলি আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি তো বলছিলেন অফিসের কাজে পাটনায় আসবেন সামনের সপ্তাহে, সেই সময় বাবার খবরটা নিয়ে এলেই হবে।

সুধাময়বাবু খুব খুশী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাই নাকি, পাটনায় আসছো?

বললাম, যাবার কথা আছে।

—যে কাজের জন্যেই যাও হোটেলে উঠতে পাবে না, আমার বাড়িতে তোমাকে গেস্ট হতে হবে। কি বল লিলি?

বিনয় করে উত্তর দিলাম, সে তো সৌভাগ্য।

লিলি জিজ্ঞেস করলে, আজ শরীর কিরকম লাগছে? বেরোবেন, না বাড়িতেই থাকবেন।

বললাম, বেরোতে হবে। উকীলবাবুর সঙ্গে দেখা করার দরকার। তোমাদের বাড়িতেও যাব।

—দিদিকে বলব আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে?

—না, সে হ্যাঙ্গামা কোর না, আমি ঠিক সুবিধেমত গিয়ে হাজির হব।

ওদের সাইকেল রিক্সা বাইরেই দাঁড়িয়েছিল। দুজনে বারান্দা থেকে নেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সুধাময়বাবু বললেন, হাজারীবাগের মজার গল্প শুনেছ?

সহাস্যে প্রশ্ন করলাম, কি ?

—এখানে দিন দুপুরে বাঘের উৎপাত শুরু হয়েছে।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

লিলি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল, সেই যে ক্যানারী পাহাড় থেকে বাঘটা বেরিয়ে গিয়েছিল, সেটাকে এখনও ধরা যায় নি। সম্প্রতি দু'একটা গরু মোষও মেরেছে।

সুধাময়বাবু নিজের মনেই হাসছিলেন, বললেন, এ যা ব্যাপার, মনে কর রিক্সা করে আমি আর লিলি যাচ্ছি, রাস্তার মাঝখানে ব্যাঘ্রমশাই নমস্কার করে বললেন—সুপ্রভাত, তখন কি করব ?

নিজের রসিকতাতেই হাসতে হাসতে রিক্সায় উঠে পড়লেন সুধাময়বাবু। লিলিও তাঁর পাশে বসল। চলতে শুরু করলো রিক্সা। আমি সেইদিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

উমেশ মল্লিকের বাড়ি বেশী সময় লাগল না। কাগজপত্র ওঁর সব ঠিক করাই ছিল, তবে আমি অসুখে পড়ে আছি শুনে এতদিন আর বিরক্ত করেন নি। আজ আমাকে দেখে খুশী হলেন, শারীরিক কুশল জিজ্ঞেস করলেন। যখন জানালাম আজ কিংবা কাল আমার চলে যাবার ইচ্ছে, উনি আর দেরী না করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমার সামনে মেলে ধরলেন। হেসে বললেন, খানকয়েক সই করে দিতে হবে যে।

বললাম, সেই জন্যেই তো আসা, বলুন কোথায় সই করবো ?

উমেশ মল্লিকের নির্দেশ মত দশ বারো জায়গায় পুরো নাম সই করলাম,—আমার দিকের আর কোনো কাজ বাকী রইল না ?

উমেশবাবু কাগজগুলো গুছিয়ে রাখছিলেন, বললেন, না। যদি কোন প্রয়োজন হয় আমি আপনাকে চিঠিতে জানাব। এ যাত্রা হাজারীবাগে আপনার ভাল কাটলো না, মিছিমিছি অনেকদিন ভুগলেন।

—সে আর কি করা যাবে। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম। মনে পড়ল নারকোলডাঙ্গার জমির কথা,—আপনি যে জমির কথা বলেছিলেন, আমি এখনও ভুলিনি। কোলকাতায় গিয়ে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। যদি ঠিকানাটা—

নিশ্চয়, নিশ্চয়। উমেশ মল্লিক খুশী হয়ে তাঁর ভাইয়ের অ্যাটর্নী অফিসের ঠিকানা একটা কাগজে লিখে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ঠিক করেই রেখেছিলাম উকীলবাবুর বাড়ি থেকে সোজা যাব বাজারে, সেখানে আমার এক চেনা স্যাকরার দোকান আছে, হয়ত সেখানে তৈরী সোনার আংটি পেতে পারি, ইচ্ছে আছে হাজারীবাগ ছেড়ে যাবার আগে লিলির হাতে সেটা পরিয়ে দিয়ে যাব।

স্যাকরার দোকানে আংটিও পেলাম, পছন্দও হল। তবে তখুনি দিতে পারল না। আংটির মাপটা ছোট করাও দরকার, সেই সঙ্গে ভাল করে পালিশ করতে হবে। স্যাকরা জানাল, রবিবার দিন দোকান বন্ধ থাকলেও সকালবেলা সে আমার বাড়ি এসে আংটি দিয়ে যাবে। ওর প্রস্তাবে রাজী হয়ে কিছু অগ্রিম মূল্য ধরে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

দুপুরের চান খাওয়া সেরে অল্পক্ষণ জিরিয়ে হাজির হলাম লিলিদের বাড়ি। সকলে বসে তখন তাস খেলছিল, আমাকে পেয়ে তাদের আর আনন্দ ধরে না। খেলা হচ্ছে সাধারণ টোয়েন্টিনাইন, কিন্তু উৎসাহ কারুর কম নেই। লাল সেটের পর কালো সেট আবার কালোর পর লাল, খেলা যেন আর থামতে চায় না। তারি মধ্যে গল্প হচ্ছে নানারকম বিষয় নিয়ে। সুধাময়বাবু বুঝি স্থির করেছেন বাসে করে পাটনায় যাবেন, সে নিয়ে বৌদির ঘোর আপত্তি। যদি রাস্তা দিয়ে যেতে হয় ট্যাক্সী নিয়ে যাও।

সুধাময়বাবু তাসের দিকে চোখ রেখে গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার অত পয়সা নেই।

—বেশ তো, পয়সা আমি দেবো। তাই বলে কষ্ট করে বাসে যেতে দেব না।

সুধাময়বাবু সকৌতুকে বলেন, শুনছ তো প্রতুল, বড়লোকের মেয়ের কথা। আমরা বাবা গরীবের ছেলে, কথায় কথায় কি আর ট্যাক্সী চাপতে পারি।

চায়ের সময় কিছুক্ষণের জন্যে খেলা বন্ধ হয়েছিল। বৌদি চট্ করে খানিকটা গরম নিমকী ভেজে আনলেন। আমিও সেই সময় রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে গল্প করছিলাম। মনে হচ্ছিল আজ সকাল থেকে আমাকে দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। বললেন, পাটনা যাওয়া হচ্ছে কবে?

—এখনও কিছু ঠিক নেই।

—কেন আমাকে মিথ্যে বোঝাচ্ছ! ঠিক তো সবই হয়ে গেছে, আমাকে বলতেই বা লজ্জা কি?

না বোঝার ভান করে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছেন?

—আহা, কচি খোকা। কিছু বোঝেন না। বলেই বৌদি আমার দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হেসে চায়ের ট্রে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন। বুঝলাম খুব অর্থপূর্ণ সে হাসি।

সে রাত্রে বৌদি আমাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন না, চায়ের পর আবার তাস বসেছিল। খেলা চলেছে রাত্রে খাওয়া পর্যন্ত।

এক সময় লিলির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। চোখে মুখে তার খুশীর হাসি উথলে পড়ছে। বললাম, বড় ভাল লাগছে তোমাদের এই পারিবারিক পরিবেশ। মনে হচ্ছে আমিও যেন এই গণ্ডীর মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

লিলি বললে, আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল।

বৌদির কথা মনে পড়ায় বললাম, সত্যিই তোমার দিদি ধরে ফেলেছে। খুব হেঁয়ালী করে আমার সঙ্গে কথা বলছিল।

লিলি সলজ্জে বলে, শুধু দিদি নয়, বাবা জামাইবাবু সকলেই।

—সে কি?

—আমার মনে হয় আমার অবর্তমানে এঁরা সবাই আমাদের নিয়ে আলোচনা করেন।

হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে তো অর্ধেক কাজ হয়ে রইল।

—তাইত মনে হচ্ছে।

—কাল কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমি একটু একলা বেরোব।

—কোথায়?

—ধর ক্যানারী পাহাড়ে। বেশীক্ষণ নয়, মিনিট পনেরর জন্যে।

—বেশ যাবো।

অন্যেরা ঘরে ঢোকার আগে আমি লিলির হাতের ওপর আলতো করে একটু চাপ দিলাম। সে চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। কী গভীর অথচ কী শান্ত সে দৃষ্টি !

লিলিদের কাছ থেকে বাড়ি ফিরলাম রাত্রি নটার পর। ইচ্ছে করছিল না ওদের ছেড়ে একলা আসতে। তবু আসতে হল। এতক্ষণ বাড়ির কথা ভুলে নিশ্চিন্ত আরামে বসেছিলাম, কিন্তু এখন যেই আমার গাড়ি এসে পাগ্‌মিল রোডের বাংলোর মধ্যে ঢুকলো, মনে হল আমি এক অন্য রাজ্যে প্রবেশ করলাম। এ বাড়ির যে নির্জন পরিবেশকে একদিন মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলাম, আজ তা আমার কাছে ভয়াবহ। গাছগুলোর সেই বড় বড় ছায়া, বাতাসের শনশন শব্দ, বাড়ির মধ্যেকার কেমন যেন সোঁদা সোঁদা গন্ধ, সব কিছু মিলে মনে করিয়ে দেয় অতীতের সঙ্গেই এ পরিবেশের মিল অনেক বেশি। আর পাঁচটা বাড়ির চলমান জীবনের সঙ্গে এর সুর মেলে না। এ সম্পূর্ণ অনন্য।

আমি বাইরের বারান্দা দিয়ে উঠে ঘরে আলো জ্বাললাম। গোবর্ধনকে বলে দিলাম আমি বাইরে খেয়ে এসেছি, সে যেন খাওয়া-দাওয়া করে এসে আমার পাশের ঘরে শুয়ে পড়ে।

আশ্চর্য, এ বাড়িতে সন্ধ্যের পর একলা থাকা মানে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করা। সমস্ত বাড়ি ঘর আসবাব জুড়ে রয়েছে প্রমীলা। তার সেই ক্ষীণ দেহ, ফ্যাকাসে মুখ, দীর্ঘ চুল। যতই তাকে মন থেকে সরিয়ে দিতে চাই না কেন সর্বনেশে কচুরীপানার মত সে এসে আমার ঘাড়ের ওপরে পড়তে চায়। জড়িয়ে ফেলতে চায় তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দিয়ে।

গোবর্ধন খাওয়া-দাওয়া করে আসতে আমি আর কালবিলম্ব না করে একটু বেশি মাত্রায় ঘুমের ওষুধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হয় নি। বেশ খুশী মনেই সকালবেলা উঠলাম। কিন্তু ব্যাঘাত ঘটাল একটা নীল খামের চিঠি, যা গোবর্ধন আমার জন্যে সাজিয়ে রেখেছিল প্রাতরাশের টেবিলে। প্রথমে চিঠিটা আমার চোখে পড়েনি, খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠতে যাচ্ছি, গোবর্ধন বললে, বাবু, একটা চিঠি রয়েছে।

ট্রের তলা থেকে চিঠিটা বার করে জিজ্ঞেস করলাম, কে লিখেছে ?

গোবর্ধন কোন উত্তর দিল না। ভাবলাম হয়ত লিলির লেখা, সাগ্রহে খামটা ছিঁড়ে ফেললাম, কিন্তু চিঠির তলায় মুরারী-মাস্টারের সই দেখে বিরক্ত না হয়ে পারলাম না।

শোবার ঘরে ফিরে এসে রুদ্ধনিঃশ্বাসে চিঠি পড়লাম, একবার নয় বার বার।

সবিনয় নিবেদন,

আজকাল আমাকে দেখলে আপনি বড় বিরক্ত হন, মিছিমিছি রাগ করেন, তাই দেখা না করে এ চিঠি লিখছি। জীবিতাবস্থায় প্রমীলাকে আপনি কথা দিয়েছিলেন যে তার মৃত্যুর পর আপনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করবেন না। এ কথা স্মরণ রাখলে ভাল হয়। অন্যথায় বিপদের আশঙ্কা আছে। ইতি—

ভবদীয়—

মুরারীমোহন ঘোষ

চিঠি পড়ে সমস্ত শরীর আমার রাগে জ্বলে উঠল। আমি প্রমীলাকে কি কথা দিয়েছিলাম তা নিয়ে মুরারী-মাস্টার মাথা গলাতে আসছে কেন? বুঝলাম, লিলির সঙ্গে আমার এ নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা আর বোধহয় গোপন নেই। অনেকেই জেনে ফেলেছে। তাই মুরারী-মাস্টার এই সাবধান-বাণী পাঠিয়ে তার গুরুত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। লোকে জানে আমি রাগী লোক। কিন্তু একবার রাগ হলে তা যে কি প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে তা অনেকেই জানে না। চিঠি পড়তে পড়তে আমি মনের মধ্যে এক পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করলাম। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললাম চিঠিটা। ছড়িয়ে দিলাম আমার খাটের চারদিকে। তার পরেই রাগ গিয়ে পড়ল প্রমীলার বাবা-মায়ের সেই ছবিটার ওপর। ডান হাত দিয়ে সেটা তুলে নিয়ে গুদোম ঘরে ঢুকে ছুঁড়ে মাটির ওপর ফেলে দিলাম। ঝনঝন শব্দে কাঁচটা ভেঙে গেল। গুদোমের চাবি বন্ধ করে বাইরের ঘরে বসে ভাবছিলাম আর কিছু করবার আছে কিনা।

এমন সময় স্যাকরা এসে পড়ায় অনেকটা মাথা ঠাণ্ডা হল। আংটিটা সে ভালই করে এনেছে। ঘর থেকে টাকা বার করে তাকে মিটিয়ে দিলাম।

চোখে মুখে অনুভব করলাম বড় বিশ্রী জ্বালা। ঠাণ্ডা জল নিয়ে মাথায় দিলাম, মুখ ধুলাম, কিন্তু কমলো না। বেশ অনেকক্ষণ ইজিচেয়ারে বসে থাকার পর তবে নিজেকে সুস্থ মনে করলাম।

ডাক্তার রায়ের বাড়ি কাছেই, গোবর্ধনকে নিয়ে তাঁর চেম্বারে গেলাম। উনি পরীক্ষা করে বললেন ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে. আজকে সারাদিন যেন আমি বিশ্রাম করি।

বললাম, মিনিট পনেরর জন্যে আমায় একবার বেরোতে হবে, বিশেষ জরুরী দরকার।

—না বেরোলেই ভাল হয়, যার কাছে যাবার, দেখুন না তাকে যদি বাড়িতে আনতে পারেন। লাল রঙের যে ট্যাবলেটগুলো দিয়েছি এখনও ঠিক আগের মত খেয়ে যান।

উদ্বিগ্ন স্বরে বললাম, কাল আমার কলকাতা ফিরে যাবার কথা।

ডাক্তার হেসে বললেন, তা হয়ত যেতে পারবেন, তাইত বলছি, আজকের দিনটা পুরো রেস্ট নিন। বেশী সিরিয়াস কিছু চিন্তা করবেন না। বকাবকি, রাগারাগি করলে নিজেরই শরীর খারাপ হবে।

ডাক্তারের কথামত খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়িতে বসে রইলাম। গোবর্ধনকে বলে দিলাম লিলিকে খবর দেবার জন্যে।

খবর পেয়েই লিলি এল। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি ব্যাপার, আবার শরীর খারাপ কেন ?

বললাম, ব্লাড প্রেসার।

—কোন অনিয়ম তো কর নি ?

—না। কলকাতায় না গেলে আর সারবে না দেখছি। কালকে চলে যাব।

লিলি গাঢ় স্বরে বলে, দেখ, একটু সামলে থেক।

বললাম, এমনিতে আমি যথেষ্ট সাবধানী, কিন্তু এবার কিরকম যেন বেকায়দায় পড়ে গেছি।

লিলি ডাক্তারের নির্দেশের কথা শুনে আমাকে ওষুধ এনে খাওয়াল।

বললাম, আমার কাছে এসে বস।

লিলি খাটের ওপর বসে জিজ্ঞেস করলে, এখন কি-রকম লাগছে ?

—ভালই। তবে দুঃখ রইল এইজন্যে যে তোমাকে কথা দিয়েছিলাম আজ ক্যানারী পাহাড়ে নিয়ে যাব, কিন্তু পারলাম না।

—তাতে কি হয়েছে, আগে শরীর।

ওকে থামিয়ে দিয়ে বাঁ হাতটা টেনে নিলাম, পকেটেই আংটিটা ছিল, বার করে সযত্নে পরিয়ে দিলাম ওর আঙুলে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ভালবাসার এই নিদর্শনে ছেলেমানুষের মত খুশী হয়ে উঠল লিলি।

—তুমি বুঝি মাথায় এইসব ভেবে রেখেছিলে ? কি অন্যায় বল ত'! আমার যে কিছু দেওয়া হল না।

হেসে বললাম, তুমি আবার কি দেবে, নিজেকে দিয়েছ, তাই পেয়েই আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে।

লিলি আবদারের সুরে বলে, না সে হবে না, আমিও তোমাকে একটা আংটি দেব।

—এখানে কোথায় পাবে, তার ওপর রোববার, আজ সব বন্ধ।

—না, তোমার ওপর আমার ভারী রাগ হচ্ছে। আমি গিয়ে দিদিকে বলি, ও নিশ্চয় ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

অনেক কষ্টে লিলিকে বোঝালাম যে, আংটি দেওয়াটা খুব বড় ব্যাপার নয়। বোঝালাম একজনের কাছে থাকলেই তো হল। ওর ভাষায়, মনের মিলটাই আসল লৌকিকতার সেখানে কোন প্রয়োজন নেই।

বাকী সময়টুকু খুব আনন্দে কাটল নানারকম গল্পের মধ্যে দিয়ে। পাটনায় আমি গেলে লিলি কি ভাবে তার বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে গেল। বিয়ের পরের

দাম্পত্যজীবনের একটা সুন্দর ছবি সে তুলে ধরল আমার সামনে। আমি যখন কাজ করতে যাব, ও তখন পড়াশুনো করবে। বাড়ির কাজ দেখবে। কিন্তু যতক্ষণ আমি বাড়িতে থাকব, সে এক পা-ও আমাকে ছেড়ে নড়বে না। তার জন্যে শাশুড়ী কিছু বললে আমাকে সামলাতে হবে।

গল্প করতে করতে কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। রাস্তার আলো জ্বলে উঠল, বাড়ির মধ্যেও। গোবর্ধনকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম লিলি রাত্রে আমার সঙ্গে খাবে।

বাইরের ড্রইংরুমেই টেবিল পেতে দুজনে মিলে খেলাম। সারাদিনের পর কথা বলার স্রোত কমে এসেছে। কিন্তু তার মধ্যে একটা বড় সুন্দর আমেজ অনুভব করলাম। দুজনের মধ্যে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার চির-নতুন অনুভূতি।

খুব ইচ্ছে ছিল বিদায়ের আগে লিলিকে কাছে টেনে নিয়ে ওকে আদর করব। কিন্তু সুধাময়বাবু এসে পড়ায় তা হল না। উনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, তাই ফেরার পথে মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

বললাম, লিলিকে আমি একলা মোটেই পাঠাতাম না। গোবর্ধন সাইকেল করে ওর রিক্সার সঙ্গে সঙ্গে যেত।

সুধাময়বাবু সায় দিলেন, ঠিক কথা। রাত্রের পর লেকের দিকটা বড় নির্জন। তবে একটা উৎপাত কমেছে। সেই পালিয়ে-যাওয়া বাঘটাকে কোন এক সাহেব গুলি করেছে।

লিলি বললে, তাই নাকি? তাহলে আর সন্ধ্যের পর ক্যানারীর দিকে যেতে ভয় করবে না আপনার, কী বলেন প্রতুলবাবু?

বাবার সামনে লিলির 'আপনি' সম্বোধন শুনতে বড় মজার লাগছিল। হেসে বললাম, তা সত্যি।

যাবার সময় লিলি বলে গেল পরদিন সকালে সে আসবে। যদি আমার শরীর ভাল থাকে একসঙ্গে বেড়াতে যাবে।

সানন্দে সম্মতি দিলাম।

লিলিরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল দরজাও যেন বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ ভেতরে আসতে পারবে না। ইচ্ছে করলে আমিও বোধহয় বাইরে যেতে পারব না! এতক্ষণ গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে যে নিস্তব্ধতার তরঙ্গকে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, তা যেন বিপুল উচ্ছ্বাসে এই বাংলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উত্তাল তরঙ্গরাশির মাঝখানে আমি ভয়ে বিস্ময়ে নির্জীব প্রাণীর মত বসে রইলাম।

এ নির্জনতা অসহ্য। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। শুধু কান পেতে থাকলে বাতাসের প্রলাপ শোনা যায়। গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে তার নিভৃত সঞ্চার। অনেকক্ষণ শুনলে গায়ের ভেতরটা কেমন যেন শির শির করে ওঠে।

মনে হল, এতদিনকার পুঞ্জীভূত চিন্তারাশি বিশৃঙ্খল জনতার মত কারুর নিষেধ না শুনে আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করার জন্যে ছুটোপাটি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুধাবন করে দেখলাম, এইসব চিন্তার মূলে কিন্তু সেই প্রমীলা। তার দেহাতীত কাল্পনিক রূপ নিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। আমার স্থির বিশ্বাস হল, এ ঘরের মধ্যে আমি একা নই, সে-ও রয়েছে। সে আমার কাছে জবাবদিহি চায়। কেন আমি তার কথা না শুনে ওর বাবা-মা'র ছবি স্থানান্তরিত করেছি। কেন লিলিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আংটি দিয়েছি। এমনি আরও কত জিজ্ঞাসা।

গোবর্ধন এসে পড়ায় খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাকে বললাম, শোবার ঘরে একটা নীল রঙের আলো লাগিয়ে দিতে, রাত্রে জ্বালিয়ে রাখব। রাত্রে যেন সে আমার ঘরের মধ্যেই শোয়। শরীরটা ভাল নেই, ডাকলে যেন তার সাড়া পাই।

ইচ্ছে করেই ঘুমের ওষুধটা বেশী মাত্রায় খেলাম। যাতে এক ঘুমে সকাল হয়ে যায়। কিন্তু আজ আর কিছুতেই ঘুম এল না। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, গোবর্ধন দরজার কাছে শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

আমি একলা জেগে রয়েছি। রাত্রি বাড়ছে, কানে ভেসে আসছে অপরিচিত খুটখাট শব্দ। হয়ত ইঁতুরদের উৎপাত, কিন্তু কানটা সব সময় খাড়া হয়ে রয়েছে, চোখে পড়ল, মুরারী-মাস্টারের লেখা চিঠিটার টুকরো অংশগুলো এখনও মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল চিঠির সাবধান-বাণী, স্পষ্ট কানে ভেসে এল ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ। সে যেন আর থামতে চায় না। মনে হল, প্রমীলার বাবা-মার ছবিটা ঐ ভাবে আছড়ে ভেঙে ফেলা আমার উচিত হয়নি।

শরীরটা খারাপ লাগছে। কোনরকম করে শুয়েই যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুম না হলে এই বড় কষ্ট।

হঠাৎ ঝম করে একটা শব্দ হল, মনে হল ভেতরে খাবার-ঘরে কিছু পড়ে ভেঙে গেল। গোবর্ধন কিন্তু দিব্যি ঘুমুচ্ছে। তু'একবার ওর নাম ধরে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। একবার ভাবলাম, নিজে উঠে গিয়ে দেখে আসি, কিন্তু সাহস হল না। খাটের ওপর উঠে বসেছিলাম, আবার শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু মন থেকে ভয় গেল না, চোখের পাতা তুটোও ভাল করে বুজতে পারছি না। যদি হঠাৎ খুলে চোখের সামনে কোন অশরীরী মূর্তি দেখি! ঠিক সিনেমার ছবির মত প্রমীলার জীবনের সমস্ত কথা

চোখের সামনে ভাসছে। কুমারী প্রমীলার জ্বলজ্বলে হাসিভরা মুখ, তার ছেলেমানুষি, খেয়াল খুশির উচ্ছ্বাস। তার বধূসাজের লজ্জারাঙা চেহারা। অভিমান-ভরা বিষণ্ণ নয়ন। ভর্ৎসনাময়ী রুদ্র মূর্তি। আমি কত চেষ্টা করছি, মন থেকে তার কথা সরিয়ে দিতে, পারছি না। ক্রমে ক্রমে তার চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মনে হল, কে যেন আমার কানে চুপি চুপি বললে ঘরের নীল আলোটা নিভিয়ে দেবার জন্যে। যন্ত্রগলিতের মত উঠলাম, আলো নিভিয়ে দিয়ে এসে চেয়ারে বসে রইলাম, আর শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, কিন্তু এ অন্ধকার অমাবস্যার রাতের মত ঘন কালো নয়। চেষ্টা করে তাকিয়ে থাকলে'এ অন্ধকার ক্রমশ চোখে সহ্য হয়ে আসে। ঘরের জিনিসপত্র আবছা ছায়ার মত চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আমি অনুভব করতে পারছিলাম একটা ভয়ঙ্কর কিছু আমার চোখের সামনে ঘটতে চলেছে। একাগ্র মনে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দূরে গোবর্ধন ঘুমে অচৈতন্য। মনে হল, তার মুখের কাছ থেকে ধোঁয়ার মত কি যেন পাক খেয়ে ওপরে উঠছে। আমার কৌতূহল হল, কিন্তু উঠে দেখবার সাহস হল না। প্রাণপণে গোবর্ধনকে ডাকবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরুল না।

কতক্ষণ এভাবে তাকিয়েছিলাম জানি না, আমার চোখের সামনে গোবর্ধনের দেহ-নির্গত সেই কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া মেঘের মত মানুষের আকৃতি ধারণ করল। বুঝতে পারলাম সমস্ত শরীর কাঁপছে। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। সেই ছায়ামূর্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার চোখ মুখ নাক, দেখতে পাচ্ছি ঘন কালো চুল, দেখতে পাচ্ছি তার মুখের নিষ্ঠুর হাসি। শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলাম, কে ওখানে?

প্রথমে কোন সাড়া পেলাম না। মনে ভরসা পেলাম, ভাবলাম হয়ত চোখের ভুল দেখছি, সাহস করে উঠে কাছে এগিয়ে গেলে হয়ত ঐ ধোঁয়ার মূর্তি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। মনে জোর করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু এগুতে পারলাম না। ছায়ামূর্তি কথা বলে উঠলো, বোস।

এ সেই প্রমীলার কণ্ঠস্বর। মাথা ঘুরে গেল, চেয়ারটা ধরে না ফেললে বোধহয় মাটিতেই পড়ে যেতাম। যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে ডাকলাম, গোবর্ধন—

কোন সাড়া পেলাম না।

উত্তর দিল প্রমীলা, গোবর্ধন এখন উঠতে পারবে না, ও ঘুমোচ্ছে। ওরই দেহ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমি তোমার সামনে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছি। ও এখন অচৈতন্য।

মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শুধু বললাম, তুমি যাও, চলে যাও। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

প্রমীলা হেসে বলল, আজ একটা বিশেষ কাজে এসেছি।

—কি কাজ ?

—অনেক রকম করে তোমাকে সাবধান করার চেষ্টা করেছি, শুনলে না, তাই সশরীরে আসতে হল। সমাজের লোক তোমাকে না চিনলেও তুমি নিজে কি তা তো ভালো করেই জানো। তবে কেন সাবধান হলে না ?

বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। কষ্ট করে দম নিয়ে বললাম, কি বলতে চাইছ তুমি ?

স্পষ্ট দেখতে পেলাম প্রমীলার চোখ দুটো. আগের মতই তীব্র, তেমনি কঠিন। বললে, তুমি খুনী।

আর্তনাদ করে উঠলাম, কী ?

—তুমি আমায় খুন করেছ। তোমার হাতের নিত্য-ব্যবহার-করা যে স্টোভটা আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলে, জানতে সেটা মেরামত করা খুব দরকার। দোকানে তোমায় সাবধান করেও দিয়েছিল, ওটা না সারালে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেইজন্যে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলে।

—আমি কিছু জানতাম না, ও একটা দুর্ঘটনা। ওতে আমার কোন হাত ছিল না—

প্রমীলা সেই একই গলায় বলে গেল, আমিও তাই ভেবেছিলাম, আর পাঁচজন লোকের মত। কিন্তু মারা যাবার পর বুঝতে পারলাম, স্টোভটা তুমি ইচ্ছে করে আমার কাছে দিয়েছিলে।

বুকের যন্ত্রণাটা বাড়ছে, হাত দিয়ে চেপে ধরে বললাম, একথা সত্যি নয়, তোমার কল্পনা।

—তাহলেই আমি খুশী হতাম। মৃত্যুর পর আমি যেরকম মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সেইরকম তোমার কাছেও গিয়েছিলাম গিরিডিতে। উঃ, ভাবতে পারিনি তুমি এত নৃশংস, এত নির্দয়। সম্পত্তির লোভে আমায় বিয়ে করেছিলে, তারপর থেকেই ভাবতে শুরু করেছ কি করে তোমার জীবন থেকে আমাকে সরাবে।

প্রতিবাদ করে বললাম—এ তুমি অন্যায় বলছ।

প্রমীলা তাকালো আমার দিকে, ভর্ৎসনামাখা সে দৃষ্টি। বললে, গাড়ি অ্যাকসিডেন্টের কথা মনে পড়ে?

উত্তর দিতে পারলাম না।

প্রমীলা বলে গেল, প্রথমবার হাজারিবাগে বেড়াতে এসে রাঁচীর পাহাড়ের ঘাটে যখন আমাদের মোটরের সঙ্গে অন্ধকারে একটা গাছের ধাক্কা লাগল, তখন ভেবেছিলাম সেও বোধহয় এক আকস্মিক দুর্ঘটনা।

কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তা মোটেই নয়। ডান দিকে বসে তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে, আমি ছিলাম বাঁ দিকের দরজায় হেলান দিয়ে। নীচের ঝোপে চাকাটা আটকে গেল বলে তোমার ইচ্ছেমত গাড়ির সঙ্গে গাছের ধাক্কাটা লাগতে পারল না। লাগলে বোধহয় সেইদিনই আমি মারা যেতাম। একবছর আগেই তুমি মুক্তি পেতে।

আমি প্রতিবাদ করতে গেলাম, কিন্তু বুকের যন্ত্রণা এত বাড়ছে যে কথা বলতে পারলাম না।

প্রমীলার নির্মম কণ্ঠস্বর আরও তীব্র হয়ে কানে বাজল, মোটর দুর্ঘটনায় আমাকে মারতে না পেরে তোমার হিংস্র স্বভাব আরও বেড়ে গেল। শুধু নিজে নয়, মা-বোনকে দিয়ে যত রকম সম্ভব অত্যাচার আমার মনের ওপর করলে। তোমার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। যদি আমি স্টোভ ধরাতে না যেতাম, যদি তোমার ফাঁদে আমি পা না দিতাম, তাহলে তুমি কি করতে? নিশ্চয় আরও কিছু ভেবে রেখেছিলে। কত রকম বুদ্ধি তোমার, একদিন না একদিন আমাকে সরিয়ে ফেলতেই তোমার জীবন থেকে।

কোন রকমে বললাম, আমার বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।

প্রমীলা বললে, আর বেশীক্ষণ কষ্ট হবে না। মারা যাবার কিছুদিন আগে আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, এ জীবনের মেয়াদ আমার ফুরিয়ে এসেছে। তাই তোমার নামে দেরাজে রেখে যাই চিঠি, গোবর্ধনের হার রেখে গিয়েছিলাম ফুলের টবে, যাতে মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারি। অবশ্য তখন বুঝতে পারিনি আমার মৃত্যুর কারণ হবে তুমি নিজে। ভাবতে পারিনি, তোমাকে পাপের শাস্তি দিতে আমায় আবার এ সংসারে আসতে হবে মানুষের রূপ নিয়ে।

আমার চোখের সামনে সব কিছু যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। শুধু উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে প্রমীলার চেহারা।

কোন রকমে বললাম, ক্ষমা কর।

জানি না সে শুনতে পেল কিনা। আমার গলার স্বর বদলে যাচ্ছে। প্রমীলা বললে, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। অনেক পাপ করেছ, এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মনে হল প্রমীলা ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে তার কী নিদারুণ ঘৃণা! কী বীভৎস মূর্তি! তুমি আমাকে আগুনে ঝলসে মেরেছ, মরবার আগে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। তুমি তো তার কিছুই পেলে না।

আমি যেন দেখতে পেলাম, আগুন জ্বলছে প্রমীলার সর্বাঙ্গে, পোড়া দাগ, শুনতে পেলাম তার আর্ত চিৎকার। কিন্তু তারও ওপরে বাঙ্ময় জগতে ভাসছে নারীকণ্ঠের অট্টহাসি। বলছে, বড় লোভ। কিছুতেই সামলাতে পারলে না। ভেবেছিলে আমার মত লিলির সম্পত্তিটাও তুমি গ্রাস করবে। দেব না, আমি তা কিছুতেই দেব না।

এক নিমেষের মধ্যে একটা বিরাট আলোর স্রোত এসে সব কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে চলে গেল।

আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আমি—আমি—আমি—

উপসংহার

প্রকাশক মহাশয়,

আমি মুরারীমোহন ঘোষ, প্রমীলার মাস্টারমশাই। রবিবার ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, আমায় কে যেন ডাকছে। তাড়াতাড়ি উঠে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যা

ভেবেছিলাম তাই, সামনেই দেখলাম প্রমীলাকে। আজ কিন্তু সে বিষণ্ণ নয়, মুখে হাসি। বললে, শেষবারের মত আপনার সঙ্গে দেখা করে গেলাম। আমি যাচ্ছি। এবার কিন্তু একলা নয়, আপনাদের জামাইকে নিতে এসেছিলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, আমার কোন কর্তব্য আছে?

প্রমীলা বললে, সকালের দিকে আমাদের বাড়িতে যাবেন। ততক্ষণে সকলে খবর পেয়ে যাবে। লোক এসে যাবে অনেক, ওর মৃতদেহ সৎকার করার জন্যে। আমার শোবার ঘরের যে ড্রয়ার থেকে চিঠি পেয়েছিলেন, সেইখানে একটা নীল রঙের খাতা পাবেন। হাজারীবাগে আসার পর থেকে আপনাদের জামাই তাতে নিজের মনের কথা লিখেছে। ওটা আপনার কাছে রেখে দেবেন। প্রয়োজন বোধ করলে প্রকাশ করবেন।

--যা করবার আমি নিশ্চয় করব। আর তোমার কোন ইচ্ছে অপূর্ণ রইল না তো?

প্রমীলার মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি। বললে, না, এবার আমি শান্তি পাব। যদি গয়ার দিকে যান, পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর দেখবেন আমাদের বাড়ি দেখাশুনোর কাজে গোবর্ধন যেন বরাবরই বহাল থাকে। কাল ওরই সাহায্যে আমি দেহ ধারণ করতে পেরেছিলাম। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেল প্রমীলা।

বলাই বাহুল্য, পরদিন সকালে প্রমীলাদের পাগ্‌মিল রোডের বাংলোয় গিয়ে দেখলাম প্রতুলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, সে মারা গেছে হার্টফেল করে। বাড়িভর্তি লোক। এসেছে ডাক্তার, এসেছেন বিজনবাবু, উমেশ মল্লিক, আর এসেছে লিলি, সঙ্গে তার দিদি, বাবা, বিমলেন্দু।

আমি সারাক্ষণ চুপ করে একান্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। রোরুদ্যমান গোবর্ধনকে সান্ত্বনা দিলাম।

মৃতদেহ নিয়ে সকলে ক্ষীরগাঁও শ্মশানের দিকে চলে যাবার পর আমি প্রমীলার কথামত তাদের শোবার ঘরের ড্রেসিং টেবিল থেকে এই নীল রঙের খাতাখানা নিয়ে এলাম। একবার নয়, বার বার এ খাতাখানা পড়েছি। এখন বুঝতে পারছি কেন প্রমীলা এ লেখাটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে যারা অবিশ্বাসী, আমার মনে হয় প্রতুল-প্রমীলার এই কাহিনীটি পড়লে তারা হয়ত মত বদলাতে পারে।

প্রকাশক মহাশয়, যদি মনে করেন এ লেখা প্রকাশের প্রয়োজন আছে, প্রকাশ করবেন, খুশী হব। পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাস্থলের প্রকৃত নাম গোপন রাখলাম। আমার ঠিকানাও দিলাম না, কারণ তাহলে পাঠক-পাঠিকাদের এত চিঠি আসবে যে, উত্তর দিয়ে শেষ করতে পারব না। তবে মনে হয় আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন। এবং বলবেন, "Truth is stranger than fiction." ইতি—

ভবদীয়

মুরারীমোহন ঘোষ।


MAHARAJA BIR BIKRAM COLLE...
LIBR
Agartala